॥ শ্রীহরিঃ॥

428▲

আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

(নিজ কর্ত্তব্য পালন এবং অপরের অধিকার রক্ষা)

गृहस्थमें कैसे रहें ? (बँगला)

গীতাপ্রেস গোরখপুর
GITA PRESS, GORAKHPUR

স্বামী রামসুখদাস

ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

রুদ্রো মুণ্ডধরো ভুজঙ্গসহিতো গৌরী তু সদ্‌ভূষণা
স্কন্দঃ শম্ভু সুতৌ ষড়ানন যুতস্তুণ্ডী চ লম্বোদরঃ
সিংহক্রৌঞ্চিমভূষকং চ বৃষভস্তেষাং নিজং বাহন
মিত্থং শম্ভুগৃহে বিভিন্নমতিষু চৈক্যং সদা বর্ত্ততে ॥

ভগবান শঙ্কর মুণ্ডমালা এবং সর্প ধারণ করে থাকেন আর পার্বতী সুন্দর অলংকার পরিধান করে থাকেন। শঙ্করের পুত্র কার্ত্তিকের ছয়টি মুখ এবং গণেশের লম্বা শুঁড় ও ভুঁড়ি। ভগবান শঙ্করাদির নিজ নিজ বাহন – বৃষ, সিংহ, ময়ূর আর মূষিক এদেরও পরস্পরের মধ্যে ভক্ষক ও ভক্ষ্য সম্পর্ক। এই পরস্পর বিরুদ্ধ সম্পর্ক সত্ত্বেও ভগবান শঙ্করের পরিবারের বিভিন্ন স্বভাবের সদস্যগণের মধ্যে সর্বদা ঐক্য বর্তমান। (এই রকমই গৃহস্থের সংসারে বিভিন্ন স্বভাবের সদস্যদের সাথে নিজের অভিমান এবং স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের হিত এবং সুখের দিকে নজর রেখে নিজেদের মধ্যে প্রেমপূর্বক একতা রাখা দরকার।)

সানন্দং সদনং সুতাশ্চ সুধিয়ঃ কান্তা ন দুর্ভাষিনী
সান্মিত্রং সুধনং স্বয়োষিতি রতিশ্চাজ্ঞাপরাঃ সেবকাঃ
আতিথ্যং শিবপূজনং প্রতিদিনং মৃষ্টান্নপানং গৃহে
সাধোঃ সঙ্গমুপাসতে – হি সততং ধন্যো গৃহস্থাশ্রমঃ ॥

সংসারে সকলে সুখী থাকে, ছেলে বুদ্ধিমান, স্ত্রী মধুরভাষিনী হয়, ভাল ভাল বন্ধুবান্ধব থাকে, নিজ পত্নীরই সাথে থাকে, চাকর বাকর আজ্ঞাপরায়ণ হয়, প্রতিদিন অতিথিসেবা এবং ভগবান শঙ্করের পূজা অনুষ্ঠিত হয়, খাওয়া দাওয়া শুদ্ধ এবং সুন্দর হয় আর প্রতিদিনই সন্তমহাত্মার সঙ্গ করা যায়. ধন্য সেই গার্হস্থ্যাশ্রম।"

ভূমিকা

আজকালকার দিনে হিন্দু সংস্কৃতির আশ্রম-ব্যবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই আশ্রম-ব্যবস্থার অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এর মধ্যে সকলের মূল হচ্ছে গার্হস্থ্যাশ্রম ; এবং এই আশ্রমের স্থিতি ক্রমশঃই দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। কলুষিত সমাজ-ব্যবস্থায় গৃহস্থের জীবন দৈনন্দিন ক্রমবর্দ্ধমান জটিল সমস্যায় পড়ে হতাশা, অশান্তি এবং উদ্বেগবহুল হয়ে পড়ছে। পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীস্বামীজী মহারাজের কাছে এইরকম বহু গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিধ সমস্যার সমাধানের পথের নির্দেশ ভিক্ষা করেন এবং পেয়ে থাকেন। সেইজন্যই এমন একখানা পুস্তিকার প্রয়োজন অনুভব করা হচ্ছিল যাতে গৃহস্থ-ধর্মের পালনীয় বিভিন্ন খুঁটিনাটির সঙ্গে সঙ্গে সংসারী মানুষের নানারকম জিজ্ঞাসারও উত্তর থাকে। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বর্তমান পুস্তিকাটির প্রকাশন ; পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ যে তাঁরা যেন নিজেরা মনোযোগ দিয়ে এটি পড়েন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ দেন। এই পুস্তিকাখানির ঘরে ঘরে পাঠ বাঞ্ছনীয়। বিবাহ ইত্যাদি সংস্কার-পালন জনিত সমাবেশেও এই পুস্তিকার বিতরণ কাম্য।

এই পুস্তিকাটি ছাড়া পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীস্বামীজী মহারাজের দুটি আরও ক্ষুদ্র পুস্তিকাও গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এদের নাম – "সন্তানের কর্ত্তব্য" এবং "মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া"। পাঠকদের কাছে এই প্রার্থনা যে তাঁরা যেন এই দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও অবশ্যই পড়েন এবং উপকৃত হন।

– প্রকাশক

(১) গার্হস্থ্য ধর্ম

প্রশ্নঃ— বিবাহ করা কেন ? বিবাহ করা কি আবশ্যক ?

উঃ— আমাদের সমাজে দু'রকম ব্রহ্মচারী দেখা যায় – নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বান । যে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে । যে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা ভোগের বাসনা পূরণ করতে পারেনা বরং ভোগের কামনা পূরণের জন্যই বিবাহ করে তাকে উপকুর্ব্বান ব্রহ্মচারী বলে । এর অর্থ হচ্ছে যে যার পক্ষে আত্মানুচিন্তন দ্বারা, মানসিক বিশ্লেষণ দ্বারা ভোগের বাসনা নিবৃত্তি করা সম্ভব হয় না তার পক্ষে বোঝবার চেষ্টা যে ভোগের দ্বারা ভোগেচ্ছার পূরণ হয়না । এই জন্যই গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ এবং তার পরে সন্ন্যাস আশ্রম পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে । সারা জীবন গার্হস্থ্য জীবনযাপন করে বিষয় ভোগ উপভোগ করা মানবজীবনের লক্ষ্য নয় ।

যার মনে বিষয়ে ভোগের ইচ্ছা রয়েছে অথবা যে বংশধারা বজায় রাখতে চায় অথচ তার অন্য কোনও ভাই নেই, তার পক্ষে ভোগবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে অথবা বংশপরম্পরা বজায় রাখার জন্য বিবাহ করা উচিৎ । আর যদি এই দুই ইচ্ছার কোনওটাই না থাকে তাহলে তার পক্ষে বিবাহের কোনও প্রয়োজন নেই । শাস্ত্রে নিবৃত্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে – **"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"** ।

প্রশ্নঃ— কলিযুগে ত সন্ন্যাসগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে মানুষের নিবৃত্তির পথ কি ?

উঃ— কলিযুগে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম পালনের পক্ষে এতরকম বিঘ্ন আসে যে মানুষ ঠিকঠিক ভাবে সন্ন্যাস ধর্মের নিয়ম পালন করতে পারে না । সেই জন্যই যেমন সরকারী কর্মচারী চাকরী থেকে অবসর নেয় ঠিক তেমনই মানুষেরও সংসার থেকে অবসর নেওয়া উচিৎ আর সাংসারিক কাজ-কর্মের দায়িত্ব সন্তান সন্ততির ওপর ছেড়ে দিয়ে, ঘরে থেকেও ভজন-পূজন করা উচিৎ । যদি সন্তানেরা প্রসন্নমনে চায় তবে সংসারের সঙ্গে কেবলমাত্র ভরণ-পোষনেরই সম্বন্ধরাখা । আর যদি সে রকম অনুরোধ

না থাকে তবে সেই সম্বন্ধও ত্যাগ করা উচিৎ । ভরণ-পোষন কেমন ক'রে চলবে এ চিন্তাও মনে না রাখা দরকার কারণ

প্রারব্ধ পহেলে রচা পিছে রচা শরীর ।
তুলসী চিন্তা কেঁও করে, ভজ লে শ্রীরঘুবীর । অর্থাৎ
প্রথমে প্রারব্ধ হয়, তার পরে শরীর ।
তুলসীদাস ভণে চিন্তা কেন ভজ মন রঘুবীর ।

প্রঃ– গৃহস্থের মুখ্য ধর্ম কি ?

উঃ– ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস – এই চার আশ্রমের ঠিকভাবে সেবা করাই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম ; কারন গৃহস্থই সকলের মা বাপ, সকলের পালন ও সংরক্ষক অর্থাৎ গৃহস্থের থেকেই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী উৎপন্ন, পালিত ও সংরক্ষিত হয় । সুতরাং এই চার আশ্রমের পালন ও পোষন করা গৃহস্থের মুখ্য ধর্ম ।

অতিথি সৎকার, গবাদি গৃহপালিত পশুর পরিচর্য্যা, ঘরে বসবাসকারী ইন্দুরাদি প্রাণীকে পর্য্যন্ত সংসারের সদস্য মনে করা ; এদের সকলের পালন পোষন করাই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম । এই রকমই দেবতা, মুনি ঋষিদের সেবা করা, পিতৃপুরুষদের জলপিন্ড দেওয়া, ভজন স্মরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবানের বিশেষ সেবাও গৃহস্থের প্রধান ধর্ম ।

প্রঃ– গৃহস্থাশ্রমে কি ভাবে থাকা উচিৎ ?

উঃ– এই মনুষ্য শরীর আবার তার মধ্যেও গৃহস্থ আশ্রম জীবের উদ্ধার প্রাপ্তির পাঠশালা । ভোগ বিলাসের জন্য বা আরাম করার জন্য এই মনুষ্য শরীর নয় ।**"এহি তন্ কর ফল বিষয় ন ভাই"** (মানস, উত্তর ৪৪/১) । শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিও খুব বড় একটা ব্যাপার নয় ; কারন ওখানে গিয়েও ভোগক্ষয় হয়ে গেলে পরে ফিরে আসতে হয় – **"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ"** (গীতা ৮/১৬) । সুতরাং সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করে গৃহস্থ আশ্রমে থাকা উচিৎ আর নিজ নিজ শক্তি অনুসারে দেহ, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা ক্ষমতা ইত্যাদি সকলের সুখে নিয়োজিত করা প্রয়োজন । অপরের সুখের জন্য নিজের সুখ-সুবিধা ত্যাগই মানুষের মনুষ্যত্ব ।

প্রঃ— সংসারে বাস করে দৈনন্দিন কাজ কর্মের মধ্যে অনেক সময় হিংসার ঘটনা ঘটে যায়। এর থেকে কি করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ?

উঃ— গৃহস্থের দৈনন্দিন কাজ কর্মের দরুন পাঁচ রকমের হিংসা হয়ে থাকে (১) রান্নার সময় আগুনে (এবং রান্নার জায়গায়) ছোট ছোট পিঁপড়া ইত্যাদি নিহত হয়, রান্নার কাঠপাতার মধ্যে ছোট ছোট কীটাদি নিহত হয়। (২) জলের কলস এধার ওধার করার সময়েও ছোট ছোট প্রাণী মারা যায়। (৩) ঝাড়ু দেবার সময় ছোট ছোট জীবাদি মরে যায়। (৪) যাঁতায় শস্য পেষার সময় অনেক জীব পিষে যায়। (৫) ঢেঁকিতে বা মেশিনে চাল ইত্যাদি কুটবার সময় বহু প্রাণী মারা যায়। এইসব অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গৃহস্থকে প্রতিদিন বলিবৈশ্বদেব, পঞ্চমহাযজ্ঞ করা উচিৎ। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানেরই শরণাপন্ন থাকে তাকে এইসব হিংসা স্পর্শ করে না। সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

প্রঃ— আমি যদি যাঁতা না ঘোরাই, ধানই না কুটি তাহলে কি হিংসা আমাকে স্পর্শ করবে ?

উঃ— আপনি যাঁতায় পেষা আটা এবং ঢেঁকিতে ভাঙ্গা চাউল যদি নিজের ভোগে লাগান তবে ওই আটা পেষায় এবং ধান কুটায় যেটুকু হিংসা হয়েছে সেটা আপনার লাগবে।

প্রঃ— খেত খামারে অনেক জীবহিংসা হয় তাই বলে কি কৃষক চাষের কাজ করবে না ?

উঃ— চাষের কাজ নিশ্চয়ই করবে কিন্তু **লক্ষ্য** রাখবে যাতে হিংসা না হয়। কৃষকের জন্য খেতের কাজ করাই বিধান তাই তার পাপ কম লাগে, কিন্তু পাপের ভয়ে তার নিজের কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়। তবে, হ্যাঁ, যতটা সম্ভব হিংসা না হয় সেদিকে সাবধানতা অবলম্বন অবশ্যই দরকার।

প্রঃ— আজকাল কৃষক ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য বিষাক্ত ঔষধ ছড়ায়, এটা কি ঠিক ?

উঃ– কৃষকের এরকম কাজ কখনই করা উচিৎ নয়। আগের দিনে লোকেরা এরকম হিংসাত্মক কর্ম করত না ফলে শস্য তখন সস্তা ছিল। আজকাল হিংসা করছে আর শস্যও দুর্মূল্য হয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে প্রাণীহত্যার ফলে শস্য বেশী উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু এর পরিণাম ভাল হবে না।

প্রঃ– শাস্ত্রে গৃহস্থের পঞ্চঋনের উল্লেখ আছে – পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভূতঋণ ও মনুষ্যঋণ। এদের মধ্যে পিতৃঋণ কি, এবং এর থেকে মুক্তির উপায় কি?

উঃ– মাতা পিতা, পিতামহ পিতামহী, প্রপিতামহ প্রপিতামহী, মাতামহ মাতামহী, প্রমাতামহ প্রমাতামহী এদের মৃত্যুর পর পারলৌকিক যে সব কর্ম করা হয় তাকে প্রেতকার্য্য বলে, আর পরম্পরাক্রমে শ্রাদ্ধতর্পণ, পিণ্ডজল দেওয়া ইত্যাদি যে সব ক্রিয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে করা হয় তাকে বলে পিতৃকার্য্য। মৃত্যুর পর জীব দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষী, ভূতপ্রেত, বৃক্ষলতা ইত্যাদি যে কোনও যোনিতেই যাক না কেন তার নাম **"পিতর"** (পিতৃপুরুষ)। মাতাপিতার রজ-বীর্য্যের দ্বারা শরীর তৈরী হয়। মাতৃদুগ্ধ এবং পিতার অর্জিত অন্নে শরীরের পালন পোষন হয়। পিতার ধনের দ্বারা শিক্ষা এবং যোগ্যতা প্রাপ্তি হয়। মাতাপিতার উদ্যোগে বিবাহ হয়। এইভাবে পুত্রের উপর মাতাপিতার, মাতাপিতার উপর পিতামহ পিতামহীর এবং পিতামহ পিতামীহর উপর প্রপিতামহ প্রপিতামহীর ঋণ থাকে। পূর্বাপর ক্রমে বর্তিত এই পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, পিতৃপুরুষের সদগতির জন্য তাঁদের নামে জলপিন্ড দেওয়া দরকার, শ্রাদ্ধ তর্পণ করা দরকার। পুত্র সারাজীবন পিতামাতা ইত্যাদির নামে জলপিন্ড দান করে, কিন্তু যদি তার মৃত্যুর পরে পিন্ডাদি দেবার জন্য সন্তান জন্ম না দেয় তবে সে পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পায় না অর্থাৎ তার উপর পিতৃপুরুষের ঋণ থেকে যায়। কিন্তু সন্তানের জন্ম দিলে তার আর পিতৃঋণ থাকে না কারণ সেই পিতৃঋণ তখন সন্তানের ওপর এসে যায়। পিতৃপুরুষেরা পিন্ডজল যাচঞা-করেন তাই তা পেলে তাঁরা সুখী থাকেন আর না পেলে দুঃখী হন। পুত্রের সন্তান না হলেও এই

দুঃখ তাঁদের মনে থেকে যায় যে এর পর আমাদের পিন্ডজল দেওয়ার আর কেউ রইল না।

প্রঃ– পিতৃপুরুষদের নামে যা দেওয়া হয় তা কি তাঁদের কাছে পৌছায় ?

উঃ– হ্যাঁ। সবকিছু যা দেওয়া হয় তা তাঁদের কাছে অবশ্যই পৌছায়। যখন জলপিন্ড দেওয়া হয় তখন তাঁরা যে যোনিতেই থাকুন না কেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিন্ডজল সেই সেই যোনির খাদ্য এবং পানীয় রূপে তাঁদের কাছে পৌছে যায়। যেমন পিতৃপুরুষ যদি তখন পশুযোনিতে থাকেন তবে তাঁর উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্ন ঘাসরূপে তাঁদের কাছে পৌছে যায় আর যদি তিনি দেবযোনিতে থাকেন তবে সেই অন্ন অমৃতরূপে তাঁর কাছে পৌছে যায়। এর তাৎপর্য্য হল এই যে যে বস্তুর দ্বারা তখন তাঁর প্রাণধারণ হয় সেই বস্তুরূপে তাঁর উদ্দেশ্যে দেওয়া জিনিস তাঁর কাছে পৌছে যায়। যেমন আমরা মনিঅর্ডার করে আমেরিকাতে টাকা পাঠালে সেই টাকা ডলাররূপে প্রাপকের কাছে পৌছায় ঠিক তেমনই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দেওয়া পিণ্ড, জল, দান, পুণ্য তাঁরা তখন যে যোনিতে থাকেন সেই যোনির অনুকূল খাদ্য বা পেয় পদার্থের রূপ নিয়ে তাঁদের কাছে পৌছয়।

আজ নিতান্ত সৌভাগ্যের সহিত যে খাদ্য পরিধেয় আমরা পাচ্ছি তা আমাদের পূর্বকৃত পুণ্যের ফলও হতে পারে অথবা পূর্বজন্মের পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ তর্পণের ফলও হতে পারে কিন্তু এটা আমাদের প্রারব্ধই। যেমন ধর কেউ ব্যাঙ্কে এক লাখ টাকা জমা রাখল। এই টাকার কিছু নিজের নামে কিছু পত্নীর নামে এবং কিছু পুত্রের নামে যদি রাখে তাহলে সে নিজের নামে জমা টাকার থেকেই টাকা তুলতে পারে, পত্নী বা পুত্রের নামে রাখা টাকার থেকে পারে না। সেই টাকা তার পত্নী বা পুত্রই তুলতে পারে। এই রকমই পিতৃপুরুষের নামে যে পিন্ডজল দেওয়া হয় সেটা তাঁরাই পান, আমি পাব না। তবে হ্যাঁ, জীবিত অবস্থায় যদি গয়াতে গিয়ে নিজের নামে পিণ্ডজল দিয়ে আসি তবে মৃত্যুর পর সেই পিন্ডজল আমারই প্রাপ্য হবে। গয়াতে পশু পক্ষীর নামে দেওয়া পিন্ডজল সেই পশু পক্ষীরা পেয়ে থাকে। এক ভদ্রলোকের

একটি গরু ছিল এবং সেই গরুটীর প্রতি তার বড়ই স্নেহ ছিল। গরুটী মৃত্যুর পর স্বপ্নে তার মালিককে বড়ই করুণ অবস্থায় দেখা দেয়। তখন সেই ভদ্রলোক গয়াতে গিয়ে সেই গরুটার নামে পিণ্ডজল দান করেন। পরে সেই গরু অতি প্রসন্ন অবস্থায় স্বপ্নে তাকে দেখা দেয়।

যেমন আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজের অর্জিত টাকা পয়সা আছে আবার পিতা ঠাকুরদার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থও রয়েছে কিন্তু নিজের অর্জিত অর্থের উপরই আমার অধিকার আছে, পিতা ঠাকুরদার অর্জিত অর্থের ওপর আমার ততটা অধিকার নেই। বংশপরম্পরাক্রমে পিতা ঠাকুরদার অর্থের উপর আমার পুত্র পৌত্রের অধিকার রয়েছে। এইভাবেই পুত্র-পৌত্রের প্রদত্ত পিণ্ডজল পিতৃপুরুষেরা পেয়ে থাকেন। সেইজন্য পিতা ঠাকুরদার পিণ্ডদানের দায়িত্ব পুত্র-পৌত্রের ওপর ন্যস্ত আছে।

যে পিতৃলোক আছে, মৃত্যুর পর সকলেই যে সেই পিতৃলোকে যাবে এমন কোনও নিয়ম নেই। কারণ নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারেই সকলের গতি নির্দ্ধারিত হয়।

প্রঃ— যদি কোনও ব্যক্তির পিতামাতা (পিতৃপুরুষ) মুক্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, ভগবৎধামে চলে গিয়ে থাকেন তবে তাঁদের নামে দেওয়া পিণ্ডজলের কি হবে ?

উঃ— পুত্রের কাছে ত এই খবর জানা থাকে না যে তার পিতামাতা মুক্ত হয়ে গেছেন এবং ভগবৎধামে চলে গেছেন ; তাই সে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে পিণ্ডজল দেয় সে সবই তার নিজের নামে জমা হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পর সে নিজেই তা পায়। যেমন আমরা কোনও ব্যক্তির নামে বোম্বাইতে টাকা পাঠালে যদি সেই ব্যক্তি সেখানে না থাকে তবে সেই টাকা আমার কাছেই ফেরত আসে।

প্রঃ— সন্তান জন্ম না দিয়েও কি মানুষ পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে ?

উঃ— হ্যাঁ, হতে পারে। যে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে তার উপর কোনও রকম ঋণই থাকে না।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃনাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃনী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবৎ ১১/৫/৪১)

অর্থাৎ "রাজন্ ! যে সমস্ত কর্মত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে শরণাগতবৎসল ভগবানের শরণ গ্রহণ করে সে দেব, ঋষি প্রাণী, আত্মীয়স্বজন, আর পিতৃগণ এদের কাছে ঋণী বা সেবক (চাকর) থাকে না।

প্রঃ— দেবঋণ কাকে বলে আর সেই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি ?

উঃ— বারিবর্ষন হয়, ধরনী তপ্ত হয়, সমীরন বইতে থাকে, ধরনী সকলকে ধারণ করে রাখে, রাত্রে চন্দ্র আর দিনে সূর্য্য প্রকাশ হয়, এই সবের দ্বারা সকলের জীবন প্রবাহ চলতে থাকে – এই সবই আমাদের উপর দেবতাদের দান এবং এটাই দেবঋণ । হোম, যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের পুষ্টি সাধিত হয় আর আমরা দেবঋণ থেকে মুক্তি পাই ।

প্রঃ— ঋষিঋণ কাকে বলে আর সেই ঋণ থেকে মুক্তির উপায় কি ?

উঃ— ঋষি মুনিগণ, সাধু মহাত্মাবৃন্দ যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, শাস্ত্র ইত্যাদি প্রণয়ন করেছেন, সেইসব থেকে আমাদের জ্ঞানলাভ হয়, শিক্ষালাভ হয়, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের বোধ জন্মে, তাই তাদের নিকটে আমরা ঋণী । ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করলে, স্বাধ্যায় করলে, আলোচনা করলে, সন্ধ্যা-গায়ত্রী অভ্যাস করলে আমরা ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাই ।

প্রঃ— ভুতঋণ কি আর তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি ?

উঃ— গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, ঘোড়া উট ইত্যাদি যত প্রাণী আছে এদের দিয়ে আমরা আমাদের কাজ করাই, আমাদের নিজেদের জীবন নির্বাহ করি । বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি থেকে ফল, ফুল,

পাতা, কাঠ এই সব সংগ্রহ করি । এইগুলো আমাদের ওপর অন্যের, প্রাণীদের ঋণ । পশু পক্ষীদের ঘাস, খাদ্য ইত্যাদি দিলে জল পান করালে, বৃক্ষ-লতাদের খাদ্য ও জল দিলে আমরা ভুতঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারি ।

প্রঃ– মনুষ্যঋণ কি এবং তার থেকে মুক্তির উপায় কি ?

উঃ– কাহারও সহায়তা ছাড়া আমাদের জীবন নির্বাহ হয় না । আমরা অপরের দ্বারা নির্মিত রাস্তায় চলাফেরা করি, অন্যের তৈরী কূপ থেকে জল নিয়ে নিজেদের কাজ করি, অপরের রোপিত গাছ চারা নিজেদের কাজে লাগাই, অন্যের দ্বারা উৎপাদিত অন্ন ইত্যাদি খাদ্য পদার্থকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করি – এতে অন্যের কাছে আমরা ঋণী হয়ে পড়ি । অপরের সুখ সুবিধার জন্য কূপ খনন করালে, জলসত্র স্থাপন করলে, বৃক্ষাদি রোপন করলে, রাস্তা তৈয়ারী করালে, ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করলে, অন্নক্ষেত্রের ব্যবস্থা করলে আমরা মনুষ্যঋণ থেকে মুক্ত হতে পারি ।

পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভুতঋণ এবং মনুষ্যঋণ – এই পাঁচ প্রকার ঋণ গৃহস্থের ওপর বর্তায় । যে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে যায় সে এই সব কোনও ঋণেই বদ্ধ হয় না, সব ঋণ থেকেই মুক্ত হয়ে যায় ।

প্রঃ– যদি কাহারও সন্তান না হয় তবে তার পক্ষে আত্মীয় স্বজনদের অথবা অনাথ বালক বালিকাকে পোষ্য নেওয়া উচিৎ কি না ?

উঃ– আজকালকার দিনে পোষ্য না নেওয়াই উচিৎ, কারণ কি না যখন নিজের জন্ম দেওয়া সন্তানেরাই সেবা করে না, আদেশ পালন করে না তখন পোষ্য নেওয়া সন্তানের ওপর আর কিসের ভরসা ? যদিও পিন্ডজল দেওয়ার জন্য পোষ্য নেওয়ার বিধান আছে তবুও সে যদি পিন্ডজলই না দেয় তবে সেই পোষ্য নিয়ে কি লাভ হবে ? আমার জীবনে যদি সন্তানের প্রয়োজন থাকতো তবে ভগবানই দিয়ে দিতেন । আমার সন্তানের প্রয়োজন নেই তাই ভগবান দেন নি ।

অতএব কেন আমি পোষ্য গ্রহণ করে নিজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করি ? প্রায়ই দেখা যায় যে পোষ্য নেওয়া সন্তান মা বাপকে দুঃখই দেয়, তাদের সেবা করে না। সুতরাং অনাথ বালকদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা দরকার, তাদের সেবা করা দরকার, তাদের শরীর নির্বাহের ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রঃ— যদি সন্তান না হয় তবে বৃদ্ধাবস্থায় আমার সেবা কে করবে ?

উঃ— যার পুত্র আছে, সেই পুত্র কি সকল ক্ষেত্রে মা বাবার সেবা করে ? আজকালকার পুত্রেরা তো মা-বাবার ধন সম্পত্তি নিজের নামে করে নিতে চায় আর শ্রাদ্ধ তর্পণকে অনাবশ্যক মনে করে, সেইসব ছেলে কি সেবা করবে ? এরা তো কেবল দুঃখদায়ীই হয়। আসলে প্রারব্ধের ফলে যেটুকু সেবা পাওনা আছে, যতটুকু সুখ আরাম হবার রয়েছে সেটা ত হবেই, তার ছেলে হোক চাই না হোক। আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি যে নিরাসক্ত সন্তের যেরকম সেবা হয়, সেই সেবা গৃহস্থের সন্তান করে না। এর অর্থ হল যে পুত্র হলেই সেবা হয় এটা ঠিক নয়।

প্রঃ— যদি কোনও পুত্র না হয় তবে মৃত্যুর পর আমার পিন্ডজল কে দেবে আর পিন্ডজল না পেলে আমার গতি কি ভাবে হবে ?

উঃ— পিন্ডজল দিলে গ্রহীতার জন্মমৃত্যুর চক্র চালু হয়ে যায়। যেমন রাস্তায় চলতে চলতে পথিকের ক্ষুৎপিপাসার দরুন কখনও থেমে যেতে হয়, যাত্রা থেমে যায় আবার অন্নজল পেলেই পুনরায় যাত্রাপথে চলতে শুরু করে। এই রকমই মৃতের আত্মা পিন্ডজল না পেলে এক জায়গায় আটকে যায়, যাত্রা থেমে যায় আবার পিন্ডজল পেলে সে ওখান থেকে চলতে শুরু করে অর্থাৎ তার যাত্রা শুরু হয়ে যায়, তার জন্ম-মৃত্যুর চক্রপথ আবর্ত্তিত হতে শুরু করে ; কিন্তু তার কল্যাণ বা মুক্তি হয় না।

বাস্তবিকপক্ষে মুক্তি হওয়া, কল্যাণ হওয়া কিঞ্চিৎ মাত্রও সন্তানের উপর নির্ভর করে না। যদি মুক্তি সন্তানের উপর নির্ভরশীল

হয় তবে মুক্তি ত পরাধীন । তাহলে মনুষ্য জন্মের স্বতন্ত্রতা কোথায় রইল ? দেহের প্রতি আসক্তিও যেখানে কল্যাণ বা মুক্তির বাধা হয়, সেখানে মৃত্যুর পরেও যদি পুত্রের থেকে পিন্ডজলের আশা থাকে তবে কল্যাণ কি করে দেবে ? সেই আশা ত বন্ধনেই বাঁধবে । সুতরাং যে নিজের কল্যাণ চায় তার পুত্রৈষণা (পুত্রের ইচ্ছা), লোকৈষণা (সংসারে আদর, সৎকার, সম্মান, প্রতিপত্তির ইচ্ছা), এবং বিত্তৈষণা (ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা) – এই তিনকে ত্যাগ করে দেওয়া চাই, কারন এই তিনটেই পরমাত্মপ্রাপ্তির পথের বাধা ।

যার সন্তানের কাছ থেকে পিন্ডজল পাওয়ার ইচ্ছা আছে সে জন্ম মৃত্যুর চক্রে পড়ে থাকতে চায় ; কারণ এক সময় জন্ম হবে তবেই ত সে পিন্ডজল চাইবে । আর জন্মই যদি না হয় তবে পিন্ডজল কার দরকার ?

পুত্র না হলে কল্যাণ হয় না – একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । কারণ সন্তান হলেই কল্যাণ হবে এটাই যদি সত্য হয় তবে শূকরীর এগারটা এবং সর্পিনীর একশ আটটা বাচ্চা হয়, তাহলে ত ওদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হওয়া উচিৎ । এইভাবে যার বেশী বাচ্চা তার কল্যাণ অতি দ্রুত হওয়া উচিৎ, কিন্তু তা হয় না ।

সন্তান হোক বা না হোক, মানুষের কেবল ভগবানেই শরণাগত হওয়া দরকার ; ভগবৎপরায়ণ হয়ে ভগবানের ভজন করা দরকার । যদি পুত্রের অর্থাৎ পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা পূরণ না হয় তবে নিঃসন্তান মানুষের উচিৎ শিশুরূপে শ্রীরামকে, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করা আর পুত্রের স্নেহে তার লালনপালন করা । ওই পুত্র (ভগবান) যেভাবে সেবা করবে, জন্ম দেওয়া পুত্র সেভাবে কখনও সেবা করতে পারে না । ওই পুত্র ইহলোক-পরলোকের সব কাজ করে দেবে ।

প্রঃ– গৃহস্থ জীবনে সন্তান সন্ততির ভরণ-পোষণ, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে নানাবিধ দুঃশ্চিন্তা থাকে, ঐসব চিন্তার হাত থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায় ?

উঃ– প্রত্যেক প্রাণী নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে জন্ম নেয়। প্রারব্ধ কর্ম তিন ভাবে হয় – জন্ম, আয়ু আর ভোগ* এই তিনের মধ্যে প্রাণীর জন্ম ত হয়েই যায় ; তার যতদিন আয়ু আছে ততদিন ত সে বাঁচবেই ; আর অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া হল ভোগ। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি কাউকে সুখী বা দুঃখী করেনা, বরং মানুষই অজ্ঞানতাবশতঃ পরিস্থিতি দ্বারা নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে করে।

কন্যা বয়স্থা হয়ে গেলে সেই পরিস্থিতিতে তার বিবাহের জন্য দুঃশ্চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই ; কারণ কন্যা তার নিজের প্রারব্ধ (ভাগ্য) কর্ম নিয়েই এসেছে। সুতরাং তার অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি তার প্রারব্ধ কর্ম অনুসারেই হবে। তার বিবাহের সম্বন্ধে মাতা পিতার বরং এই রকম চিন্তা করা দরকার যে যেখানে আমার কন্যা সুখী থাকবে সেখানেই তার বিবাহ দেওয়া দরকার। এইরকম বিচার বিবেচনা করা মাতাপিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি ওকে সুখী করে দেব, ওকে সমৃদ্ধ পরিবারে বিয়ে দেব এসব মাতা পিতার সাধ্যের মধ্যে নেই। সুতরাং কর্ত্তব্য পালন নিশ্চয়ই করা উচিৎ কিন্তু তার জন্য দুঃশ্চিন্তা করা উচিৎ নয়।

চিন্তা এক আর বিচার বিবেচনা অন্য জিনিস। অজ্ঞান (মূর্খতা) থেকে দুঃশ্চিন্তার উদয় আর তার থেকে অন্তঃকরণ ময়লা হয় ; নতুন কিছু উদ্ভব হয় না। কিন্তু বিচার বিবেচনা দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ হয়। সুতরাং নানারকম কার্য্য কিভাবে করা যায়, কি নিয়মে করা উচিৎ এইসব বিচার-বিবেচনা করা উচিৎ কিন্তু চিন্তা অর্থাৎ দুঃশ্চিন্তা কখনই করা উচিৎ নয়। যদি দুঃর্ভাবনারহিত হয়ে বিচার বিবেচনা করা যায় তবে কোনও না কোনও উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

প্রঃ– পুত্র যদি বৃদ্ধাবস্থায় সেবা না করে তাহলে কি করা উচিৎ ?

---

* সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা। (যোগদর্শন – ২/১৩)

উঃ– পুত্রের ওপর নিজের মমতা দূর করা দরকার। মনে করা উচিৎ যে এরা আমার নয়। কেউই যদি সেবা না করে তাহলে এই অবস্থায় আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে যে সুখ-সুবিধা পাওয়ার আশা করা হয় তাতে দুঃখই হয়ে থাকে – **"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।"** কাজেই সেই আশাকেও ত্যাগ করা প্রয়োজন এবং কষ্ট করে তপস্যার কথা চিন্তা করা দরকার এবং এই মনে করা দরকার যে "ভগবানের অশেষ করুণায় আমার সামনে এই তপস্যার সুযোগ এসেছে। যদি পরিবারের লোকেরা আমাকে সেবা করত তবে আমি তাদের মোহ মমতার ফাঁদে পড়ে যেতাম কিন্তু ভগবান কৃপা করে আমাকে সেই ফাঁদে পড়তে দেননি।"

মানুষ মোহ, মমতার আবর্তে পড়ে যায় – এতেই তার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি হয়। সেই বিঘ্ন যিনি দূর করেন তাকে ত উপকারীই মনে করা উচিৎ। কারণ সে আমার বিঘ্ন নাশ করছে, আমার কল্যাণ করছে। আমার উপর তাঁর এটা অতি দুর্লভ কৃপারই পরিচায়ক।

সমস্ত জীবন সেবা পেতে থাকলে বৃদ্ধাবস্থায় নিজের অসমর্থতার দরুন, পরিবারের সকলের কাছ থেকে নেবার ইচ্ছা আরও বেশী বেড়ে যায়। সুতরাং মানুষের প্রথম থেকেই সাবধান থাকা দরকার যে এ জগতে আমি সেবা নেবার জন্য আসিনি, বরং আমি ত সকলকে সেবা করবার জন্যই এসেছি ; কারণ মানুষ, দেবতা, ঋষি-মুনি, পিতৃপুরুষ, পশু-পক্ষী, ভগবান ইত্যাদি সকলের সেবা করার জন্যই মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি। সুতরাং কারুর কাছ থেকেই সুখ সুবিধা গ্রহণ করা উচিৎ নয়। আর যদি আমরা প্রথম থেকেই কারুর কাছ থেকে সুখ সুবিধা বা সেবা না নেবার অভ্যাস করি তবে বৃদ্ধাবস্থায় সেবা না পেলেও দুঃখ হবেনা। হ্যাঁ, আমাদের মনে সেবা গ্রহণের ইচ্ছা না থাকায়, অন্যের মনে আমাদের প্রতি সেবা করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে।

জীবনের সব ক্ষেত্রেই ত্যাগের আবশ্যকতা আছে। ত্যাগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ শান্তি পাওয়া যায়। প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে এসেও প্রসন্ন থাকা মহৎ তপস্যা। অন্তঃকরণের শুদ্ধি তপস্যার ফলে হয়,

আরাম, সুখ প্রত্যাশা করলে অন্তঃকরণ কলুষিত হয়.। অতএব মানুষের কখনও সুখ চাওয়াই উচিৎ নয়। বরং নিজ মন, বাণী, শরীর দ্বারা অপরের সুখ সাধন করাই আচরনীয় ।

প্রঃ– যদি পরিবারের মধ্যে কারও মৃত্যু হয় তাহলে মৃত আত্মার শান্তির জন্য এবং নিজের শোক দূর করার জন্য কি করা উচিৎ ?

উঃ– (১) মৃত আত্মার জন্য বিধিসম্মত নারায়ণবলি, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা দরকার ।

(২) যখন তাঁকে মনে পড়বে তখনই তিনি ভগবানের শ্রীচরণে রয়েছেন –এরূপ ভাবনা করা ।

(৩) তাঁর উদ্দেশ্যে গীতাপাঠ, ভাগবৎ সপ্তাহ, শ্রীরামচরিতমানস নয় দিনে পাঠ করার অনুষ্ঠান, নাম-জপ, কীর্ত্তন ইত্যাদি করা উচিৎ।

(৪) তাঁর উদ্দেশ্যে গরীব বালকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা উচিৎ । মিষ্টি পেলে বালকেরা খুব খুসী হয় । সেই খুসীতে মৃত আত্মার শান্তি হয় এবং নিজের শান্তি হয় ।

সৎসঙ্গ, কথা-কীর্ত্তন, মন্দির তীর্থাদি ভ্রমণ ব্যাপারে দুঃখ করা উচিৎ নয়, বস্তুতঃ এই সব স্থানে নিশ্চয়ই যোগ দেওয়া দরকার । এতেও সৎসঙ্গের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, কারণ সৎসঙ্গের ফলে সব রকম শোক দূর হয়ে যায় ।

(২) ব্যবহার

প্রঃ– পরিবারে বয়জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিৎ ?

উঃ– বড়দের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, তাদের সেবা করা, সম্মান দেওয়া, আদর-যত্ন করা, আজ্ঞা পালন করা, শাসন মেনে চলা ইত্যাদি – এসব ছোটদের কর্ত্তব্য । কিন্তু বড়দের এরকম কর্ত্তব্য নয়

যে সে মনে করবে আমি বড়, আমি পূজনীয়, আদরণীয় । কারণ এরকম ভাব মনে থাকলে এদের প্রতি অন্যদের মনে শ্রদ্ধার ভাব কমে যায়, এবং ক্রমে অশ্রদ্ধার ভাব এসে যায় । অতএব বড়দের উচিৎ সকলের পালন পোষন করা, কষ্ট সহ্য করেও ছোটদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখা । ছোট এবং বড়দের এইরকম মনোভাব থাকলে সম্পূর্ণ পরিবার এবং সমাজ সুখী হয় ।

প্রঃ– বিধবা স্ত্রীদের সঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ী, মা বাবার কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিৎ ?

উঃ– বাড়ীর বৌ বা মেয়ে যদি বিধবা হয়ে যায় তবে শ্বশুর শাশুড়ী, মা বাবার তাদের প্রতি আন্তরিক আদর করা দরকার আর বাইরের থেকে রক্ষা এবং শাসন করা উচিৎ, যাতে তারা বিপথে না চলে যায় । আসল কথা হল যে তাদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাতে সে মনে কষ্টও না পায়, আবার বিপথেও না চলে যায় ।

বৌ অথবা মেয়ে বিধবা হলে শাশুড়ী অথবা মায়ের কর্ত্তব্য হল যে তারা যেন সাদাসিধে ভাবে জীবন-যাপন করে । শাড়ী-গয়না, খাদ্য পানীয়তে ভোগবৃত্তি না আনে, কেবলমাত্র জীবন নির্বাহের মতই সব কিছু করে । এইরকম করলে বৌ অথবা মেয়েও সৎভাবে থাকবে । কারন শাশুড়ী এবং মা ভোগবিলাসে ব্যস্ত থাকলে তার প্রভাব বৌ এবং মেয়ের ওপর ভাল হয়না । যদি শাশুড়ী এবং মা নিজ জীবনে সংযম পালন করে তবে তার প্রভাবে বৌ এবং মেয়েরও মঙ্গল হবে যাতে করে তাদের জীবন সুখের হবে । শাশুড়ী এবং মায়ের এইরকম বিচার করা প্রয়োজন যে আজ এই অবস্থায় সংযম পালন না করব তো কবে আর করব ? সংসারে সংযমী এবং ত্যাগীরই গুণগান হয়, ভোগী এবং বিষয়ীর নয় ।

প্রঃ– বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে ভাই এবং ভাইয়ের বৌ-এর কি রকম ব্যবহার হওয়া উচিৎ ?

উঃ– ভাই এবং ভাইবৌ-র বিধবাকে অন্তর দিয়ে আদর-যত্ন করা উচিৎ, তাকে কখনও তিরস্কার করা উচিৎ নয় । তার চরিত্র

এবং অভিমান রক্ষা করে তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করা দরকার। তার হিতের দিকে নজর রেখে তাকে শাসন এবং প্রেম দুইই করা দরকার।

প্রঃ– মেয়ের ঘরের অন্ন পিতামাতার খাওয়া উচিৎ কি না ?

উঃ– কন্যাদানের (বিয়ে দেওয়া) পর কন্যা সেই ঘরের মালিক হয়ে গেছে, কাজেই মাতাপিতার তার ঘরের অন্ন গ্রহণের অধিকার নেই। দান করে দেওয়া বস্তুর ওপর দাতার কোনও অধিকার থাকেনা। আমি এক কাহিনী শুনেছি। বরসানা গ্রামের এক মুচি সকাল বেলা কার্য্যোপলক্ষে নন্দগাঁও গিয়েছিল। সেখানে বেলা গড়িয়ে দ্বিপ্রহর হয়ে যায়। তখনও সে কিছু খাওয়াদাওয়া করেনি। পিপাসা পেয়েছে কিন্তু মেয়ের গ্রামের জল ত পান করা যায়না ; (বরসনা গ্রামের লোক শ্রীরাধাকে নিজেদের মেয়ে মনে করে)। কারণ আমাদের বৃষভানুজী এই গ্রামে কন্যা দান করেছেন – এইরকম চিন্তা করে সে ওখানকার জল পান না করে বরসনা গ্রামের দিকে ফিরে যেতে থাকে। চলতে চলতে পিপাসায় কাতর হয়ে পথের ওপর পড়ে যায়। সেই সময় শ্রীরাধাজী ওই মুচির কন্যার রূপধারণ করে তার কাছে এসে বলে, "বাবা, আমি আপনার জন্য জল নিয়ে এসেছি, পান করুন।" মুচি তখন বলে, "মাগো, আমি এখনও নন্দগাঁওয়ের সীমানার মধ্যে রয়েছি ; কাজেই আমি এখানকার জল পান করতে পারি না।" শ্রীরাধাজী বললেন, "বাবা, আমি ত বরসান-এর জল নিয়ে এসেছি।" তখন সে সেই জল পান করে নিয়ে বলল, "তুমি বাড়ী যাও, আমি ধীরে ধীরে আসছি।" শ্রীরাধাজী চলে গেলেন। মুচি নিজের ঘরে পৌছে নিজের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে বলল, "তুমি জল পান করিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ ! যদি তুমি জল নিয়ে না আসতে তবে জল পিপাসায় আমার মৃত্যু হতো !" মেয়ে বলল, "বাবা, অমি ত জল নিয়ে যাইইনি"। তখন সেই মুচি বুঝতে পারল যে শ্রীরাধাজীই আমার মেয়ের রূপ ধারণ করে আমাকে জল পান করাতে এসেছিল। এর দ্বারা এই বোঝা যায় যে আগেকার দিনে মানুষেরা নিজের মেয়ের শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের পর্য্যন্ত অন্নজল গ্রহণ করত না।

যতদিন না কন্যার সন্তান হয় ততদিন তার ঘরের অন্নজল গ্রহণ না করাই উচিৎ। কিন্তু মেয়ের সন্তান হয়ে গেলে মা বাবা মেয়ের ঘরের অন্নজল গ্রহণ করতে পারে। কারণ জামাতা কেবল পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই অপরের কন্যা গ্রহণ করেছে। সেই কন্যার সন্তান হলে জামাতা পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন মেয়ের উপর বাবা মায়ের অধিকার হয়ে যায়, সেইজন্যই ত দৌহিত্র তার দাদু দিদিমার শ্রাদ্ধ তর্পণ করে, তাদের পিন্ডজল দেয় আর পরলোকে দাদু দিদিমা নিজ দৌহিত্রের কৃত শ্রাদ্ধ তর্পণ, পিন্ডজল ইত্যাদি গ্রহণও করেন। যদি কন্যার সন্তান পুত্র না হয়ে কন্যা হয় তাহলেও কন্যার ঘরে অন্নজল গ্রহণ করতে পারেন কারণ সন্তান হলেই কন্যাদান সফল হয়।

প্রঃ– মাতা পিতা এবং ছেলেমেয়ের নিজেদের মধ্যে কি রকম ব্যবহার হওয়া উচিৎ ?

উঃ– মাতাপিতার মনোভাব এমন হওয়া উচিৎ যে পুত্র কন্যা আমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে ; সুতরাং এদের ইহলোক পরলোকের মঙ্গল আমাদের দেখা দরকার। আমাদের কেবল নিজেদের সুখ বা আরাম ভোগ করা নয়, বরং এদের মঙ্গল কিসে হয় এই ভাবনা নিয়ে পুত্র কন্যাকে শাসন করা দরকার, তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন আর যদি কখনও তাড়না করা দরকার হয় তবে সেটাও ওদের মঙ্গলের জন্যই করা উচিৎ।

পুত্র-কন্যার এই ভাব হওয়া উচিৎ যে যে শরীর দিয়ে আমি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হতে পারি, মহান আনন্দের অধিকারী হতে পারি, সেই শরীর আমার মা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। সুতরাং আমার দ্বারা এদের কখনও দুঃখ উৎপত্তি না হয়। আমার জন্য যেন এদের কখনও অপযশ না হয়। আমার আচরণ এমন হওয়া দরকার যাতে এদের আদর ও সম্মান বৃদ্ধি হয়। আমি তীর্থভ্রমণ, ব্রতাচরণ ইত্যাদি যা কিছু শুভ কর্ম করব তার ফল (পুণ্য) যেন মাতা পিতারই প্রাপ্তি হয়। এইরকম ভাব নিয়ে থাকলে নিজেদের মধ্যে প্রেম বৃদ্ধি পাবে, সর্বদা পরিবার সুখী হবে এবং ভবিষ্যতে সকলের কল্যাণ হবে।

প্রঃ– পতি আর পত্নীর নিজেদের মধ্যে কি রকম ব্যবহার হওয়া উচিৎ ?

উঃ– পতির এমন মনোভাব থাকা প্রয়োজন যে আমার স্ত্রী তার মাতা-পিতা, ভাই-বোন সকলকে ছেড়ে আমার কাছে এসেছে এতে তার কত ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে । সুতরাং তার যেন কোনরকম কষ্ট না হয়, জীবনধারণের জন্য ভাত, কাপড়, বাসস্থানের জন্য যেন কখনও কষ্ট না হয়, আমার থেকেও যেন এ বেশী সুখী হয় । এ প্রকার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর পতিব্রতা ধর্মের দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে সে উচ্ছৃঙ্খল না হয় আর তার কল্যাণ হয় । পত্নীর এইরকম ভাবনা হওয়া উচিৎ যে আমি নিজের গোত্র এবং কুটুম্ব ইত্যাদি সকলকে ত্যাগ করে আমার স্বামীর কাছে এসেছি সুতরাং সমুদ্র পার হয়ে তীরে এসে যেন ডুবে না যাই অর্থাৎ আমি এত ত্যাগ করে এসেছি কিন্তু আমার থেকে এ যেন কোনও দুঃখ না পায় । এর অপমান, নিন্দা, তিরস্কার না হয় । আর যদি আমার জন্যে এর কোন নিন্দা হয় তবে সেটা বড়ই অনুচিৎ হবে । আমি নিজে যতই কষ্ট পাই না কেন কিন্তু এর যেন কিঞ্চিৎমাত্রও কষ্ট না হয় । এইরকমই পত্নী নিজের সুখ আরাম ত্যাগ করে পতির সুখ আরামের দিকে সর্বদা নজর রাখবে ; তার ইহলোক পরলোকের কি করে মঙ্গল হবে সেদিকে নজর রাখবে ।

প্রঃ– শাশুড়ি এবং বৌএর নিজেদের মধ্যে কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিৎ ?

উঃ– শাশুড়ীর মনোভাব এমন হওয়া উচিৎ যে বৌ নিজের মাকে ছেড়ে আমার সংসারে এসেছে আর এ আমার পুত্রেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী, সুতরাং আমার ব্যবহার এমন হওয়া উচিৎ নয় যাতে তার নিজের মাকে মনে পড়ে ।

বৌ-এর ভাবটা এমন হওয়া উচিৎ যে যার জন্য আমার এয়োতির গর্ব এই শাশুড়ি হচ্ছেন তার নিজের জননী । যে আমার সর্বস্ব সে এই বৃক্ষেরই ফল । সুতরাং এঁকে সম্মান করা উচিৎ,

ভালবাসা উচিৎ । কষ্ট যখন আসবে সেটা যেন আমি ভোগ করি কিন্তু সুখ যেন ইনি ভোগ করেন । ইনি আমার সঙ্গে যতই কঠোর ব্যবহার করুন না যেন, সবই আমার মঙ্গলের জন্য । এটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে আমার অসুখের সময় আমার শাশুড়ী যত সেবা করেন, তত সেবা অন্য কেউ করতে পারেনা । বাস্তবিকপক্ষে শাশুড়ী আমার হিত কামনা করে যে ব্যবহার করেন এইরকম ব্যবহার অন্য কারুর মধ্যে দেখাও যায়না আর সম্ভবও না । ইনি আমাকে বৌরানী নামে ডেকেছেন আর তাঁর নিজের উত্তরাধিকার দিয়েছেন । এইরকম অধিকার অন্য কে দিতে পারে ? এর এই ঋণ আমি কোনও জন্মেই শোধ দিতে পারব না।

সুতরাং আমার দ্বারা যেন এঁর কিছুমাত্র এবং কোনওপ্রকার কষ্ট না হয় । এইরকমই নিজের ভাই-বোনের থেকেও ভাশুর, ভাশুরের স্ত্রী, দেওর, দেওরের স্ত্রীকে বেশী আদর করা দরকার । ভাশুর ও ভাশুরের স্ত্রী মাতাপিতার সমতুল্য আর দেওর দেওরের স্ত্রী পুত্র কন্যার সমান । সুতরাং এইরকম ভাবনা রাখা দরকার যে এদের সুখ কিসে হবে। আমি কেবল সেবা করার জন্যই এদের সংসারে এসেছি কাজেই আমার ছোট থেকে বড় সমস্ত কাজই কেবল এদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে, সুখ এবং আরামের জন্য হওয়া উচিৎ । আমার সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করছে এ চিন্তা আমার কখনই করা উচিৎ নয় । কারন এদের কঠোর ব্যবহারও আমার মঙ্গলেরই কারণ হবে ।

প্রঃ— বৌদি এবং দেওরের নিজেদের মধ্যে কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিৎ ?

উঃ— বৌদি হচ্ছেন সীতাদেবীর মত আর দেওর হচ্ছেন ভরতের মত । সীতাদেবী ভরতকে নিজের পুত্রের মত জ্ঞান করতেন । কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠিয়ে দেন কিন্তু সীতাদেবী কখনও ভরতের ওপর দোষারোপ করেননি । ভরতকে অনাদর করেননি, উপরন্তু চিত্রকূট পর্বতে যখন ভরত সীতাদেবীর চরণধূলি নিজের মস্তকে ধারণ করেন, তখন সীতাদেবী তাঁকে আশীর্বাদ করেন । বৌদির ব্যবহার এইরকম হওয়া উচিৎ যাতে দেওর যতই না অনাদর করুক, অপমান করুক কিন্তু বৌদির নিজের মাতৃভাব, হিতৈষীভাব কখনও

ত্যাগ করা উচিৎ নয় আর দেওরের উচিৎ বৌদিকে মায়ের মত আদর-যত্ন করা, সম্মান করা । যদিও সীতাদেবী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তত জ্যেষ্ঠা ছিলেন না, তবুও ভরত, লক্ষ্মন এরা সীতাদেবীকে মাতৃস্বরূপ জ্ঞান করতেন ।

প্রঃ— ভগ্নীপতি এবং শ্যালকের নিজেদের মধ্যে কেমন ব্যবহার থাকা উচিৎ ?

উঃ— ভগ্নীপতির এরকম হওয়া উচিৎ যে আমার স্ত্রী যেমন আমার ভালবাসার পাত্রী, সেইরকমই শ্যালক আমার স্ত্রীর প্রিয় ভ্রাতা হওয়ার দরুন সেও তেমনই ভালবাসার পাত্র । এর কাছ্ থেকে সব সময়ই কিছুনা কিছু পাওয়াই হয় ; অতএব লৌকিক দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় তো লাভই লাভ, প্রাপ্তিই প্রাপ্তি – পরমার্থিক দৃষ্টিতে তো ত্যাগের প্রাধান্যই রয়েছে ।

আবার শ্যালকেরও এই মনোভাব থাকা উচিৎ যে ভগ্নীপতি আমার ভগ্নীর আদরণীয় অংশ ; অতএব ইনি আমারও আদরের পাত্র । যেমন ভগ্নীকে, কন্যাকে দেওয়া-থোয়া করলে ভাল লাগে তেমনই ভগ্নীপতিকে দেওয়া-থোয়া করলে ভাল লাগার ভাব জাগে । ইনি ভালবাসার, দেওয়ার পাত্র ; তাই আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে এঁকে দিতে থাকা উচিৎ ।

প্রঃ— ভাই আর বোনের নিজেদের মধ্যে কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিৎ ?

উঃ— প্রায়শঃই ভাইয়ের দিক থেকেই ত্রুটি হয় । বোনের দিক থেকে কম ত্রুটি হয় । সুতরাং ভাই-এর এরকম ভাব রাখা উচিৎ যে আমার বোন সদাহাস্যময়ী, দয়ার মূর্ত্তি, একে বেশী করে সম্মান ভালবাসা দেওয়া উচিৎ । ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে যেমন পূণ্য হয় তেমনই ভগ্নী বা কন্যাকে দেওয়া থোয়া করলে হয় ।

সরকার থেকে পিতার সম্পত্তিতে ভগ্নীর অংশ প্রাপ্য করে যে আইন করেছেন, তাতে ভাইবোনে বিবাদ হতে পারে, মনকষাকষি হওয়া তো নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার । বোন যখন নিজের অংশ দাবী

করবে তখন ভাইবোনে আর সদ্ভাব থাকবে না। সম্পত্তির অংশ নিয়ে যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বিসংবাদ হয়, তখন ভাইয়ে বোনে বিবাদ হবে এতে আর বলার কি আছে! সুতরাং বোনের পক্ষে আমাদের পুরানো রীতিই (পিতার সম্পত্তির অংশ না নেওয়া) অনুসরণ করা উচিৎ কারণ সেই রীতি ধর্মসঙ্গত এবং পবিত্র। ধনসম্পত্তি কিছু মহৎ বস্তু নয়। এ তো কেবল ব্যবহারের জন্য। সেই ব্যবহারের সময়ও তার মধ্যে ভালবাসাকে মাহাত্ম্য দিলেই তার মর্য্যাদা বাড়ে, ধনকে মাহাত্ম্য দিলে নয়। ধন ইত্যাদি পদার্থের ওপর স্বার্থপরতা তখন ত কলহের কারণ হয়ই, আর পরিণামেও নরকের পথ সুগম করে, এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। যেমন কুকুর নিজেদের মধ্যে খুব প্রেমের সঙ্গে খেলা করে, কিন্তু সে খেলা ততক্ষনই হয় যতক্ষন না তাদের সামনে খাবার পড়ে। সামনে যেই মাত্র খাবার পড়ল সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। আর মানুষও যদি এরকমই করে তবে তার মধ্যে মনুষ্যত্ব কোথায় ?

ধর্মকে, নিজ নিজ কর্তব্যকে, ভগবান এবং মুনি-ঋষিদের আদেশ, ত্যাগকে মর্য্যাদা দিলে ইহলোক-পরলোক স্বতঃই সফল হয়। কিন্তু মান, অহংকার, স্বার্থ ইত্যাদিকে বড় মনে করলে ইহলোক এবং পরলোক দুইই নষ্ট হয়।

প্রঃ– অতিথির সঙ্গে গৃহস্থের কিরকম ব্যবহার করা প্রয়োজন ?

উঃ– অতিথি কথার অর্থ হল, যার আগমনের কোনও তিথি, কোনও নিশ্চিত সময় নেই।

অতিথি সেবার সুযোগ বা অধিকার গৃহস্থ আশ্রমেই আছে কথঞ্চিৎ বানপ্রস্থ আশ্রমেও আছে। ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর জীবনে অতিথি সেবা মুখ্য ধর্ম নয়। যখন ব্রহ্মচারী তার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে স্নাতক হয়ে যায় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সমুদয় নিয়ম পালন করে পরবর্তী আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তুতি করে তখন তাকে দীক্ষান্তে এই উপদেশ দেওয়া হয় – **'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।'** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শিক্ষা ১১/২) অর্থাৎ মাতা,

পিতা, আচার্য্য এবং অতিথিকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করবে। গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশকারীর পক্ষে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন। সুতরাং অতিথিকে গৃহস্থের যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করা দরকার।

অতিথি সেবার নিয়মের মধ্যে আসন দেওয়া, ভোজন করানো, জলপান করানো ইত্যাদি বহুপ্রকার বিধি নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সর্বপ্রধান বিধি হচ্ছে অন্নপ্রদান। খাদ্য পদার্থ তৈয়ারী হয়ে গেলে প্রথমে বিধিসম্মত বলিবৈশ্বদেব করা প্রয়োজন। বলিবৈশ্বদেব করার অর্থ হল সকলকে খাদ্য উৎসর্গ করা। তারপর ভগবানের ভোগে লাগান। তারপর কোনও অতিথি বা ভিক্ষার্থী এসে গেলে তাকে ভোজন করান। ভিক্ষার্থী ছয় রকমের হয়।

ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ।
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ।

ব্রহ্মচারী, সাধুসন্ন্যাসী, বিদ্যা অধ্যয়নকারী, গুরুসেবাকারী, পথিক এবং ক্ষীণবৃত্তি যোর ঘর অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ; চোর ডাকাতে সব অপহরণ করে নিয়ে গেছে, যার জীবনধারণের আর কোনও পথই নেই, – এই ছয় প্রকার ভিক্ষুক বলা হয়ে থাকে – সুতরাং এই ছয় প্রকার ব্যক্তিকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য।

যদি বলিবৈশ্বদেব করার আগেই অতিথি, ভিক্ষুক এসে যায় তবে ? যদি সময় থাকে তবে বলিবৈশ্বদেব করে নেওয়া, আর যদি সময় না থাকে তবে প্রথমেই ভিক্ষার্থীকেই অন্নদান করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী তো পাক করা খাদ্যের মালিক। এদের অন্ন না দিয়ে নিজে আগে ভোজন করে নিলে প্রত্যবায় হয় এবং তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ☆চান্দ্রায়ণব্রত পালন করা দরকার।

☆চান্দ্রায়ণব্রতের বিধি – আমাবস্যার পরে প্রতিপদ তিথিতে এক গ্রাস, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস – এই ক্রমে তিথির সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস বাড়িয়ে পূর্ণিমাতে পনের গ্রাস অন্ন গ্রহণ করা। পরে পূর্ণিমার পর প্রতিপদ থেকে এক গ্রাস কম করে যেতে হবে অর্থাৎ প্রতিপদে চৌদ্দ, দ্বিতীয়াতে তের ইত্যাদিক্রম। এর তাৎপর্য্য হল যে চন্দ্রের কলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসের সংখ্যা বাড়ান আর কমবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসের সংখ্যা কমান এর নাম চান্দ্রায়ণব্রত। এই অন্নের গ্রাস ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

অতিথি যদি দ্বারে এসে খালি হাতে ফিরে যায় তাহলে সেই অতিথি ওই গৃহস্থের পুণ্য নিয়ে যায় আর নিজের পাপ দিয়ে যায়। সুতরাং অতিথিকে অন্নদান অবশ্যই কর্ত্তব্য। গৃহস্থের পক্ষে মনে মনে অতিথিকে পরমাত্মার স্বরূপ মনে করা দরকার এবং তাকে আদর আপ্যায়ন করা, অন্নজল দেওয়া দরকার কিন্তু বাইরের থেকে সাবধান থাকা দরকার অর্থাৎ তাকে সংসারের বৈভব না জানান, তাকে ঘর দেখান এসব করা উচিৎ নয়। তাৎপর্য্য হল যে মনে মনে সম্মান করলেও তার ওপর বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, কারণ আজকাল অতিথির ভেক ধরে কেনা কে আসে কে জানে !

প্রঃ– গৃহস্থের ধর্ম হচ্ছে সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে আগে ভোজন করান আর সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে গৃহস্থের ভোজনের পর ভিক্ষায় যাওয়া, তাহলে এদের সামঞ্জস্য কি করে হবে ?

উঃ– গৃহস্থের কর্ত্তব্য হচ্ছে ভোজনদ্রব্য রান্না হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে বলিবৈশ্বদেব করা আর তার পরে অতিথি এসে গেলে তাকে ভোজন আপ্যায়ন করা ; যদি অতিথি তখন না আসে তবে একটি গাভী দোহন করতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ বাড়ীর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অতিথির জন্য অপেক্ষা করা। অতিথি যদি না আসে তবে তার ভাগ আলাদা করে রেখে তারপর ভোজন করা।

সন্ন্যাসী কিছুই সঞ্চয় করেনা। সুতরাং তার যখন ক্ষুধা পায় তখন সে ভিক্ষার জন্য গৃহস্থের দরজায় যায়। গৃহস্থের ভোজনের পর যখন বাসনকোসন মেজে পরিষ্কার করে আলাদা রেখে দেওয়া হয় তখন সন্ন্যাসী ভিক্ষায় বের হয়। এর কারণ হল যাতে গৃহস্থের ওপর বোঝা না হয়, তার খাদ্যে কম না পড়ে। দু'একজনের বাড়ীতে খাদ্য রান্না করার পর যদি ভিক্ষার্থী আসে তাহলে কম পড়বে ! তবে হ্যাঁ যদি বাড়ীতে ৫/৭ জনের রান্না হয় তবে খুব একটা ইতরবিশেষ হবেনা ; কিন্তু যদি ওই বাড়ীতে বেশী ভিক্ষার্থী এসে যায় তবে খাদ্যে কম ত পড়বেই। সুতরাং ভোজন সমাধার পরেই সন্ন্যাসীর ভিক্ষায় যাওয়া উচিৎ আর ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই নেওয়া উচিৎ। সন্ন্যাসীর উচিৎ যাতে সে ভিক্ষার জন্য গৃহস্থের দরজায় দীর্ঘ

সময় অপেক্ষা না করে। গৃহস্থ যদি প্রত্যাখ্যান না করে তবে গাভী দোহনে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু গৃহস্থের দরজায় অপেক্ষা করা। যদি গৃহস্থের মনে দানের ইচ্ছা না থাকে তবে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু ক্রোধ করা উচিৎ নয়। এইভাবেই গৃহস্থেরও ক্রোধ করা উচিৎ নয়।

প্রঃ— নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে গৃহস্থের কিরকম ব্যবহার করা উচিৎ ?

উঃ— প্রতিবেশীকে নিজের পরিবারেরই সদস্য মনে করা উচিৎ। এ আপন ও পর – এরকম তুচ্ছ ভাবনা ছোট অন্তঃকরনের পরিচায়ক। উদার অন্তঃকরণ ব্যক্তির কাছে সমস্ত পৃথিবীই তার আপন কুটুম্ব।* সকলকেই ঈশ্বরের সন্তান হওয়াতে আমারা সকলেই ভাই। সুতরাং নিজের সংসারের লোকেদের মতই প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বাড়ীতে যদি কখনও ফল মিষ্টি আসে আর সেই সময় নিজের ঘরের সন্তানের সঙ্গে প্রতিবেশীর সন্তানও থাকে তাহলে সেই সব ভাগ করার সময় প্রতিবেশীর সন্তানকে আগে এবং একটু ভাল ও বেশী দেওয়া দরকার। এর পর বোন এবং মেয়ের সন্তানদের বেশী এবং ভালটা দেওয়া উচিৎ। এর পর কুটুম্ব পরিজন এবং বড় ভাইয়ের সন্তানেরা থাকলে তাদের দেওয়া। সর্বশেষে অবশিষ্ট যা থাকবে তা নিজের সন্তানদের দেওয়া। এতে যদি কারুর মনে শঙ্কা জাগে যে আমার সন্তানদের কম এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জিনিসই কি সর্বদা দেব ? এতে কম হয়না। আমি যদি প্রতিবেশী বা বোন এবং মেয়েদের সন্তানদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করি তাহলে তারাও আমার সন্তানদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করবে যাতে হরেদরে সব সমানই হয়ে যাবে। আসল কথা হল যে পরস্পর এইরকম ব্যবহার করলে নিজেদের মধ্যে প্রেম বহুগুন বেড়ে যাবে। প্রেমের মূল্যায়ন জিনিসপত্র দিয়ে হয়না।

---

*অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনালঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ (পঞ্চতন্ত্র, অপরিক্ষীত ৩৭)

প্রতিবেশীর কোনও গরু মোষ নিজের বাড়ীতে এসে পড়লে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিৎ নয় বা ওই পশুদের প্রহার করাও নয় বরং প্রতিবেশীকে বুঝিয়ে বলা যে "ভাই, তোমার গরু মোষ আমার ঘরে এসে গেছে, একটু খেয়াল রেখো যেন আর না আসে।" আমি যদি এরকম শান্ত ব্যবহার করি তাহলে আমার গরু মোষ প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেলে সেও তখন এইরকমই ব্যবহার করবে। যদি প্রতিবেশী খারাপ ব্যবহার করে তাহলে আমার তার ওপর ক্রোধ করা উচিৎ নয়, বরং আমার এদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার যাতে আমার গরু মোষ ইত্যাদির দ্বারা প্রতিবেশীর কোনও ক্ষতি না হয়।

আমার বাড়ীতে যদি কোনও উৎসব, বিবাহ ইত্যাদি হয় আর সেই উৎসবে ভাল ভাল মন্ডামিঠাই আসে তাহলে প্রতিবেশীর সন্তানদেরও তা দেওয়া উচিৎ ; কারণ প্রতিবেশী হওয়ার দরুন সেও আমার কুটুম্বই হয়ে যায়। এর চেয়েও বেশী সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করলে নিজের মেয়েবোনের বিয়েতে যে রকম দেওয়া থোয়া হয় সেইরকমই প্রতিবেশীর মেয়েবোনের বিয়েতে দেওয়া-থোয়া করা উচিৎ ; নিজের জামাইয়ের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা হয় সেইরকম প্রতিবেশীর জামাইয়ের সঙ্গেও।

প্রঃ– ভৃত্যের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিৎ ?

উঃ– ভৃত্যের সঙ্গে নিজের পুত্রের মত ব্যবহার করা উচিৎ। ভৃত্য দুরকম হিসাবে নিযুক্ত হয়, এক হল যে বেতন এবং খাদ্য পায় ; আর দ্বিতীয় হল শুধু বেতন পায় এবং সে নিজের ঘরে খায়। যে ভৃত্য বেতনও নেয় এবং খাদ্যও নেয় তার সঙ্গে খাদ্যের বেলায় পার্থক্য করা উচিৎ নয়। বেশীরভাগ গৃহেই ভৃত্যের জন্য তৃতীয় শ্রেনীর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে, সংসারের সদস্যদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেনী আর নিজের পতিপুত্রের জন্য প্রথম শ্রেনীর ভোজন তৈরী হয়। এই তিনরকম ভোজন না করে একই ভোজন তৈরী করা উচিৎ। সেই ভোজন মধ্যম শ্রেনীর হওয়া উচিৎ আর সকলের জন্য হওয়া উচিৎ। সময়মত কোনও ভিক্ষার্থী এসে গেলে তাকেও সেই ভোজনই দেওয়া।

যে ভৃত্য কেবল বেতনই নেয় ভোজন গ্রহণ করেনা সে তার নিজের পছন্দমত ভোজন তৈরী করে এবং খায় । কিন্তু আমার ঘরে যদি কখনও বিশেষ কারণে মিঠাই ইত্যাদির ব্যবস্থা হয় তবে ওই ভৃত্যের সন্তানদেরও সেই মিঠাই দেওয়া উচিৎ । বিবাহ ইত্যাদি উৎসবের সময় তাদের কাপড় চোপড় দেওয়া উচিৎ । তাকে বেতন ত সময়মত দেওয়া চাই উপরন্তু সময়ে সময়ে তাকে বখ্‌শিস, কাপড়, মিঠাই ইত্যাদিও দেওয়া উচিৎ । বেশী বেতনেও সেই ভাব হয়না, যেইভাব বখ্‌শিস ইত্যাদিতে হয় । বখশিস যে দেয় তার হৃদয়ে উদারতা আসে, পরস্পরের মধ্যে প্রেমভাবের বৃদ্ধি হয় ; এতে সময়মত কখনও সে চোর ডাকাতের হাত থেকেও আমাকে রক্ষা করবে ; বিবাহ ইত্যাদি উৎসবের সময় সে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে ।

প্রঃ— ঘরে বাসা বাঁধা ইঁদুর, টিকটিকি, মশা, ছারপোকা এদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিৎ ?

উঃ— ঘরে থাকা ইঁদুর ইত্যাদিকেও নিজের পরিবারের সদস্য মনে করা উচিৎ ; কারণ ওরাও নিজেদের ঘর বানিয়ে আমাদের ঘরে বাস করে । তাই ওদেরও আমাদের ঘরে থাকার অধিকার আছে । এর তাৎপর্য্য হল এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের ক্ষতি না করে ওদের পালন করা যায় ততক্ষণ তাই করা উচিৎ । কিন্তু আজকাল মানুষেরা ওদের মেরে ফেলে, এটা ঠিক নয় । মানুষের নিজেকে রক্ষা করারই অধিকার আছে । অপরকে হত্যা করার অধিকার নেই । এই পৃথিবীর ওপরে যেমন মানুষ তার নিজের ঘর তৈরী করে বসবাস করে, এইরকমই ইঁদুর ইত্যাদিও নিজেদের ঘর বানিয়ে বসবাস করে ; সেইজন্য তাদের হত্যা করা ঠিক নয় । ঘরে সাপ, বিছে ইত্যাদি বিষধর প্রাণী থাকলে তাদের কৌশলে ধরে নিয়ে বাড়ীর থেকে দূরে সুরক্ষিত জায়গায় ছেড়ে দেওয়া দরকার । নিজেরা পরিস্কার না থাকলে, অশুচি অবস্থায় থাকলে মশা মাছি ছারপোকা ইত্যাদি জন্ম নেয়। সেই জন্যই গৃহের স্বচ্ছতা, নির্মলতা রাখা দরকার যাতে ওদের জন্ম না হয় । পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা সত্ত্বেও যদি ওরা জন্ম নেয় তাহলেও ওদের হত্যা করার অধিকার কারুর নেই ।

প্রঃ– বাড়ীতে কুকুর পোষা ঠিক কি না ?

উঃ– ঘরে কুকুর রাখা ঠিক নয় । কুকুরকে যে পালন করে সে নরকগামী হয় । মহাভারতে উল্লেখ আছে যে যখন পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে বীরসন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে উত্তর দিকে চলতে থাকে তখন চলতে চলতে পথে ভীম ইত্যাদি সকলেই পড়ে যান । শেষে যুধিষ্ঠিরও যখন কাতর হয়ে পড়েন, তখন ইন্দ্রের আজ্ঞায় মাতলি রথ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে আসে এবং ওই রথে সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করে । যুধিষ্ঠির সেই সময় দেখেন যে তার পেছনে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে আছে । তিনি বলেন যে এই কুকুরটি আমার শরণ নিয়েছে ; সুতরাং এও আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে । ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন –

স্বর্গলোকে শ্ববতাং নাস্তি ধিষ্ণ্যমিষ্টাপুর্তং ক্রোধবশা হরন্তি ।
ততো বিচার্য্য ক্রিয়তাং ধর্মরাজ ত্যাজ শ্বানং নৃশংসমস্তি ॥

(মহাভারত, মহাপ্র – ৩/১০)

"ধর্মরাজ ! কুকুর পালনকারীর জন্য স্বর্গে জায়গা নেই । সেই ব্যক্তির যজ্ঞ করাতে, কূপ, পুষ্করিনী খনন করানোতে যে পূণ্য হয় তা সমস্তই ক্রোধবশ নামক রাক্ষস হরণ করে নেয় । সুতরাং চিন্তাভাবনা করে কাজ করুন আর এই কুকুরকে ছেড়ে দিন । এতে কোনও নির্দ্দয়তা হয়না ।"

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি একে পালন করিনি, এ আমার শরণে এসেছে । আমি একে আমার অর্দ্ধেক পূণ্য দিয়ে দিচ্ছি তার দ্বারা এ আমার সঙ্গে যাবে । যুধিষ্ঠির এই কথা বলার পর ওই কুকুরের থেকে ধর্মরাজ প্রকট হয়ে বললেন যে –"আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম । তুমি আমাকে পরাজিত করেছ, এখন চল স্বর্গে চল ।"

এর তাৎপর্য্য এই হল যে গৃহস্থের কুকুর রাখা ঠিক নয় । মহাভারতে আছে –

ভিন্নভাণ্ডং চ খটবাং চ কুক্কুটং শুনকং তথা ।
অপ্রশস্তানি সর্বাণি যশ্চ বৃক্ষো গৃহেরুহঃ ॥
ভিন্নভাণ্ডে কলিং প্রাহুঃ খটবয়াং তু ধনক্ষয়ঃ ।

কুক্কুটে শুনকে চৈব হবির্নাশ্নন্তি দেবতাঃ ।
বৃক্ষমূলে ধ্রুবং সত্ত্বং তস্মাদ্ বৃক্ষং ন রোপয়েৎ ।
(মহাভারত, অনু ১২৭/১৫-১৬)

"বাড়ীতে ভাঙ্গা বাসন, ভাঙ্গা খাট, মুরগী, কুকুর এবং অশ্বত্থাদি বৃক্ষ হওয়া সুলক্ষণ নয় । ভাঙ্গা বাসনে কলিযুগের বাসস্থান বলা হয় । ভাঙ্গা খাট ঘরে থাকলে ধনহানি হয় । মুরগী এবং কুকুর থাকলে সেই গৃহে দেবতা হবিষ্য গৃহণ করেন না, আর বাড়ীর মধ্যে বড় বৃক্ষ জন্মালে তার শিকড়ের গর্ত্তের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বাসের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে এইজন্য বাড়ীর মধ্যে গাছ লাগিয়ো না ।"

কুকুর খুবই অপবিত্র অশুচি এবং অপবিত্র কুকুরের খাদ্য পানীয়ের থেকে, স্পর্শ থেকে, এখানে ওখানে নোংরাভাবে বসা শোওয়াতে, গৃহস্থের খাদ্য-পানীয়, থাকা বসা অশুচি হয় তাতে সব অপবিত্র হয়ে যায় এবং অপবিত্রের ফলও (নরক ইত্যাদি) অপবিত্রই হয় ।

প্রঃ– খেত খামার রক্ষার জন্য কুকুর রাখলে ক্ষতি কি ?

উঃ– কুকুরকে কেবল খেত খামার রক্ষার জন্যই রাখা যায় । নির্দিষ্ট সময়ে তাকে খাবার দাও কিন্তু নিজের কাছ-থেকে তাকে দূরেই রাখ । কুকুরকে নিজের সঙ্গে রাখা, নিজের সঙ্গে বেড়ান অবিহিত ছোঁয়াছুঁয়ি করাই নিষিদ্ধ । এর তাৎপর্য্য হল যে কুকুরকে পালন করা, তাকে রক্ষা করায় দোষ নেই কারণ প্রাণীমাত্রেই পালন করা গৃহস্থের মুখ্য কর্ত্তব্য । কিন্তু কুকুরের সঙ্গে একাঙ্গীভাবে থাকা, তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখা, ওই প্রাণীতে আসক্তি রাখা পতনের কারণ ; অন্তিম সময়ে যদি কুকুরেরই স্মরণ হয় তবে পরজন্মে কুকুর হয়েই জন্ম নিতে হবে ।★

★যং যং বাপি স্মরন্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ (গীতা ৮/৬)

"হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! মানুষ অন্তকালে যে যে ভাব চিন্তা করতে করতে এই শরীর ত্যাগ করে, সে ওই ভাবে সর্বদা ভাবিত হওয়ায় তাই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই সেই যোনিতেই জন্ম নেয় ।

প্রঃ– বাড়ীর ছাদে দেওয়ালে অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মে গেলে সেটা ফেলে দেওয়া উচিৎ কিনা ?

উঃ– ওই বৃক্ষকে উঠিয়ে ফেলে চৌরাস্তার মোড়ে অথবা মন্দিরের সামনে অথবা গলির মধ্যে ভাল জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে তাতে জল দেওয়া দরকার । ছাদ বা দেওয়াল ভাঙ্গতে হলে ক্ষতি নেই সেখানে আবার মেরামত করে নেওয়া যায়, কিন্তু যতটা পারা যায় অশ্বত্থকে কাটতে নেই । অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, গুলর, আমলকী, তুলসী ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষের বিশেষ যত্ন করা উচিৎ কারণ এরা মানুষকে পবিত্র করে ।

প্রঃ– গৃহস্থের জীবন যাপনের জন্য কি ভাবে অর্থ উপার্জন করা উচিৎ ?

উঃ– দৈহিক পরিশ্রম করে এবং অন্যের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যের হানি না হয় এই রকম সাবধানতা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করা উচিৎ । যতটা ধন উপার্জন হয় তার এক দশমাংশ বা পঞ্চদশাংশ অথবা বিংশাংশ ভাগ দানপুণ্যের জন্য খরচা করা দরকার । অর্থ উপার্জনের কর্ম্মে কিছু কিছু দোষ হয়েই যায়, সুতরাং ওই দোষের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ধন খরচ করা দরকার ।

প্রঃ– আজকাল সরকারী আইন এ রকম হয়ে গেছে যে সৎভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় না, সুতরাং কি করা দরকার ?

উঃ– সরকারী আইনের থেকে বাঁচার উপায় আছে – নিজের খরচ কমান ; খাদ্য, সৌখীনতা, সাজসজ্জা ইত্যাদিতে খরচ না করা, সাধারণভাবে জীবন নির্বাহ করা, নিরাড়ম্বর সাত্ত্বিক জীবন যাপন করা । কারণ অর্থ রোজগার আমার হাতে নয়, অর্থ যতটা পাওয়ার ততটাই পাওয়া যাবে, কিন্তু খরচ কম করা নিজের সাধ্যের মধ্যে, এখানে আমার নিজের স্বাধীনতা রয়েছে ।

প্রঃ– এটা ত ঠিক কথাই যে আমি পুরাপুরি ট্যাক্স দিলে টাকা চলে যাবে আর ট্যাক্স পুরাপুরি না দিয়ে কিছুটা লুকিয়ে ফেললে টাকা বেঁচে যায়, সুতরাং লুকিয়ে ফেলাই ভাল কি না ?

উঃ– আপাততঃ এই রকম মনে হয় যে ট্যাক্স না দিলে অর্থ বেশী থাকছে, কিন্তু আখেরে ওই টাকা থাকবেনা* । এইভাবে যে টাকা বাঁচবে সেই টাকা কোনও কাজেও আসবে না, বরং সেই অর্থের জন্য মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনা এবং যে সব অন্যায় করতে হয় তার জন্য শাস্তিত পেতেই হবে এবং অন্যায়ভাবে উপার্জ্জিত অর্থও পৃথিবীতে রেখে গিয়ে মরতে হবে । এর অর্থ হচ্ছে যে অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ হয় ডাক্তার, উকিল এদের হাতে যাবে, নয়ত চোর ডাকাতে নিয়ে যাবে, আর নয়ত ব্যাঙ্কে পড়ে থাকবে কিন্তু আপনার কাজে আসবে না । সুতরাং যে অর্থ নিজের কাজে আসবে না, তার জন্য পাপ অন্যায় এসব করার কি দরকার ?

সৎভাবে উপার্জ্জন করলে যে রোজগার কম হবে এটা ঠিক নয় যে টাকা আসবার সে ত আসবেই । তবে কিভাবে আসবে তা জানা নেই কিন্তু যে টাকা আস্‌বার তা নিশ্চয়ই আসবে । এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে অর্থ ছেড়ে দেয়, টাকা নেয়না, তার কাছেও টাকা আসে । এর অর্থ হল যে যেইভাবে অভাব, ব্যাধি, দুঃখ ইত্যাদি না চাইলেও, চেষ্টা বা ইচ্ছা না করলেও, তারা আসে, ঠিক এইভাবেই যে টাকা আসবার, যে সুখ আসবার, তা না চাইলেও বিনা চেষ্টায়ই আসবে –

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ ।
দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেৎ তদ্ বুধঃ ॥
(শ্রী মদ্ভাঃ ১১/৮/১)

"রাজন্ ! প্রাণীমাত্রেই যেমন ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও প্রারব্ধ অনুসারে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এই রকমই ইন্দ্রিয়জনিত সুখ স্বর্গে এবং নরকেও প্রাপ্ত হয় । সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষের উচিৎ সে ওই সুখের ইচ্ছা করবেনা ।

---

*অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যং দশবর্ষাণি তিষ্টতি ।
প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে সমূলং তদ্বিনশ্যতি ॥
'অন্যায়ভাবে উপার্জ্জিত ধন দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে এবং এগার বছরে পা দিলেই সেই ধন সুদে আসলে বিনষ্ট হয়ে যায়"

(৩) সন্তান সম্বন্ধীয় কথোপকথন

প্রঃ– আদর্শ সন্তান কি ভাবে জন্ম নেয় ?

উঃ– আদর্শ সন্তানের জন্ম তখনই সম্ভব হয় যখন মাতা পিতার আচরণ, চিন্তা সব আদর্শ হয় এবং যখন সন্তান জন্ম দেবার উদ্দেশ্য কেবল পিতৃ ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই হয়, নিজের সুখের উদ্দেশ্যে নয় । কারণ নিজের সুখ আসক্তি চরিতার্থ করার ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় সেই সন্তান প্রায়ই উৎকর্ষতার দিক থেকে নিকৃষ্ট হয় । কুন্তীর আচরণ, চিন্তন সবই আদর্শ রকমের ছিল তাই স্বয়ং ধর্ম্মরাজ কুন্তীর কোলে জন্ম নেন ।

গর্ভবতী হওয়ার সময় থেকে মায়েদের কর্ত্তব্য হল নিজের সন্তানকে উৎকৃষ্ট এবং ভাল হিসেবে জন্ম দেওয়ার জন্য ভগবৎকথা, ভগবৎভক্তের চরিত্র শ্রবন, চিন্তন এবং সেই সব চিত্র দর্শন করা । এই প্রকার মায়ের ভিতর সৎ ভাবের আসন থাকলে উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হয় । যেমন, যখন প্রহ্লাদের মা গর্ভবতী ছিলেন তখন নারদ গর্ভস্থিত সন্তানকে লক্ষ্য করে তাঁর মাকে ভগবৎকথা শোনাতেন, উপদেশ দিতেন যার ফলে রাক্ষসকুলে হয়েও প্রহলাদের মত আদর্শ সন্তানের জন্ম হয়েছিল ।

সৎকর্ম (সদাচার), সচ্চিন্তন, সৎসর্চ্চা, আর সৎসঙ্গ– এই চার প্রকার সৎ । ভাল কাজ করা সৎকর্ম । অপরের হিত এবং ভগবানের চিন্তন হচ্ছে সচ্চিন্তন । নিজেদের মধ্যে ভগবানের লীলা, ভগবৎভক্তের চরিত্র আলোচনা করা হল সৎচর্চা । আমি ভগবানের আর একমাত্র ভগবানই আমার এইভাবে ভগবানের সাথে অটলরূপে স্থিত থাকাই হচ্ছে সৎসঙ্গ । এই চারভাবে গর্ভাবস্থায় জীবন যাপন করলে আদর্শ উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম দেওয়া যায় ।

মানুষের মধ্যেই কেবলমাত্র এই শক্তি (যোগ্যতা) আছে যে সে নূতনের জন্ম দিতে পারে, নিজের উন্নতি করতে পারে, নিজেকে উৎকর্ষ দান করতে পারে । কাজেই মানুষের উচিৎ সন্ত–মহাত্মাদের সঙ্গ করা । সন্ত মহাত্মা না পাওয়া গেলে যে সব সাধক তৎপরভাবে সাধন

ভজনে লিপ্ত রয়েছেন সেই সাধকদের সঙ্গ করা । এই রকম সাধকও যদি না পাওয়া যায় তবে গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি সৎ শাস্ত্রের পঠন পাঠন এবং মনন করা এবং নিজের কল্যাণের চিন্তা মনে জাগরুক রাখা। এইভাবে সেই মানুষ উৎকৃষ্ট পুরুষ হতে পারে ।

প্রঃ– মাতা পিতার আচরণ, ভাবনা যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্ত্বেও সন্তান ভাল হয় না এর কারণ কি ?

উঃ– এর প্রধান কারণ সঙ্গদোষ অর্থাৎ বালকের ভাল সঙ্গের অভাব । ঋন শোধের দরুণ পূর্বজন্মের প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তিতেও এই রকম সন্তানের জন্ম হয় । যে পুত্র কুসঙ্গে খারাপ হয় সে সৎসঙ্গের দ্বারা শুধরে যেতে পারে । কিন্তু পূর্বজন্মের প্রতিশোধ নেবার জন্য যে আসে সে ত কেবল দুঃখই দেবে । সুতরাং নিজের আচরণ, ভাবনা ভাল হওয়া সত্ত্বেও যদি কুসন্তান জন্ম নেয় তবে পূর্বজন্মের ঋণ মনে করে প্রসন্ন থাকা উচিৎ এই ভেবে যে এতে আমার ঋণ শোধ হয়ে যাচ্ছে।।

বিশ্রবা ব্রাহ্মণ কুলের পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী কৈকেসী রাক্ষসকুলজাতা ছিলেন যার জন্য রাবণের জন্ম হয় । উগ্রসেন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ছিলেন, কিন্তু একদিন এক রাক্ষস উগ্রসেনের রূপ ধারণ করে তাঁর পত্নীর সাথে সহবাস করে, যার দরুণ কংসের জন্ম হয় ।

প্রঃ– মাতা পিতার আচরণ ভাল নয় কিন্তু তাদের সন্তান ভাল হয়– এর কি কারণ ?

উঃ– প্রায়শই পিতামাতার স্বভাবই সন্তানে বর্ত্তায়, কিন্তু ঋণ পরিশোধের কারণে অথবা গর্ভাধারণের সময় কোনও রকম শুভ সংস্কারের প্রভাবে অথবা গর্ভে থাকা অবস্থায় কোনও সন্তমহাত্মার সঙ্গ পেলে ভাল সন্তান জন্মে যায় । যেমন হিরণ্যকশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ জন্মেছিলেন । প্রহলাদের বিষয়ে কথিত আছে যে তপস্যায় বিঘ্ন ঘটার দরুণ হিরন্যকশিপু স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বাড়ীতে আসেন এবং গর্ভাধানের সময় কথাবার্ত্তার মধ্যে তার মুখ থেকে বেশ কয়েকবার **"বিষ্ণু"** নামের উচ্চারণ হয় । যখন তার স্ত্রী কয়াধু গর্ভবতী ছিলেন তখন গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে নারদ তাকে ভক্তিকথা শ্রবণ

করান । এই কারণে প্রহ্লাদের ভিতর ভক্তির সংস্কার এসে যায় । যেমন জলের স্বাদ সর্বদাই মধুর, কিন্তু মাটীর সংস্পর্শে এসে জলের স্বাদ বদলে যায়, ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় (প্রত্যেক কূয়ার জল আলাদা আলাদা স্বাদের), এই রকমই সঙ্গের প্রভাবে মানুষেরও ভাব বদলে যায় ।

প্রঃ— পিতার আত্মাই পুত্রের রূপ নিয়ে আসে – এই কথার তাৎপর্য্য কি ?

উঃ— যেমন কোনও কোনও লোক কোনও ব্রাহ্মণকে তার কুলগুরু মনে করে, কেউ যজ্ঞোপবীত দেওয়া গুরুকে গুরু মানে, কিন্তু যখন এদের শরীর থাকেনা তখন এদের পুত্রকে গুরু মানে এবং তাকে যেমন আদর আপ্যায়ণ করা★ হয় তার পুত্রকেও সেই রকমই আদর আপ্যায়ণ করে । যেমন পিতা ধনসম্পত্তির মালিক থাকেন আর পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সেই সম্পত্তির মালিক হয়, এইরকমই পুত্রের জন্ম হয় তো সে পিতারই প্রতিনিধি হয়, পিতার জায়গায় কাজ করবার কর্ত্তা হয় ।

এখানে আত্মার অর্থ গৌণাত্মা অর্থাৎ আত্মা শব্দ শরীরের বাচক । শরীরের থেকে শরীর (পুত্র) জন্ম নেয়, সুতরাং ব্যবহারিকভাবে পুত্র পিতার প্রতিনিধি হয় ; কিন্তু পরমার্থিক (কল্যাণ) বিষয়ে পুত্রের কোনও স্থানই নেই ।

প্রঃ— সন্তানদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় যাতে তারা উৎকৃষ্ট হয় ?

উঃ— বালকেরা প্রায়ই দেখে দেখে শেখে । সুতরাং মাতাপিতার উচিৎ যে তারা সন্তানের সামনে নিজেদের আচরণ ভাল রাখে, নিজেদের জীবন সংযমিত ও পবিত্র রাখে । এই রকম ভাবে শিক্ষা দিলে সন্তান সৎশিক্ষা পাবে এবং ভাল হবে ।

★ যখন অর্জুন অশ্বত্থামাকে বেঁধে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে আসেন তখন দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে ছেড়ে দেবার অভিপ্রায় জানিয়ে অর্জুনকে বলেন যে যাঁর কৃপায় আপনি সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রের জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন আপনার সেই আচার্য্য দ্রোণই পুত্র (অশ্বত্থামা) রূপে আপনার সামনে দন্ডায়মান –
"স এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে ।"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৭/৪৫)

সন্তানের উন্নতির জন্য প্রথমতঃ তো মাতাপিতা নিজেদের আচরণ ভাল রাখবে, দ্বিতীয়তঃ তাকে ভাল ভাল কথা শোনাবে, উচ্চ রকমের শিক্ষা দেবে, ভক্তদের ও ভগবানের চরিত্র কাহিনী শ্রবন করাবে। ভাল শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যার দ্বারা সন্তান তার ব্যবহারে পরমার্থের রীতিনীতি শেখে। এই বিষয়ে কিছু কথা বলা হচ্ছে।

মাতাপিতা কখনও বাইরে যেতে হলে সন্তানকে বলে 'তুমি' এখন এখানে থাক, এইরকম করলে বাচ্চা শুনতে চায়না, জিদ করে যাতে মাতাপিতারও মনে বিক্ষেপের সৃষ্টি হয় আর বাচ্চাও কষ্ট পায় ফলে ঘরে অশান্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং বাচ্চাকে প্রথম থেকেই এ রকম বলে রাখা উচিৎ যে "আমি যদি কখনও কোথাও যাই তবে জিদ করোনা, আমি যে রকম বলি সে রকম করবে।" প্রত্যেক দিন ৩/৪ বার এই রকম বলে দিলে বাচ্চা এই শিক্ষা মেনে নেবে। এর ফলে কোথাও যাওয়ার সময় বাচ্চাকে বলে দেওয়া যে " জিদ করোনা, আমি যেমন বলি তেমন করো"। তখন সে তোমার কথা শুনবে।

বাড়ীতে মিঠাই, ফল, ভাল ভাল খাদ্য পদার্থ এলে বাচ্চারা সেটা খাবার জন্য জিদ করে। কাজেই যেই সময় বাড়ীতে ওই সব জিনিষ নেই তখন দিনে ২/৩ বার বাচ্চাকে শেখান উচিৎ যে "কোনও খাবার জিনিষ এলে প্রথমে অন্যকে দেবে তার পর যা থাকবে সেটা তুমি খাবে।" এর ফলে ভাল জিনিষ সামনে এলে যদি সে তখনও জিদ করে তবে তখন তাকে বলা "দেখো বাবা, জিদ করোনা অন্যকে দিয়ে তারপর নিজে খাও – ভাগ করে খাও আর বৈকুণ্ঠেতে যাও।" তখন সে আর জিদ করবে না। এইভাবে আপনি যেই যেই শিক্ষা বাচ্চাকে শেখাতে চান, সেই সেই কথাগুলি দিনে ২/৩ বার বাচ্চাকে শুনিয়ে দিন আর আদর করে তাকে দিয়ে সেই কথাগুলি স্বীকার করিয়ে নিন।

বাচ্চাদের ভাল ভাল কথা শেখান চাই ; যেমন– দেখো বাবা, কখনও কোনও জিনিস চুরি করোনা। মায়ের থেকে চেয়ে নেবে, না দিলে কেঁদে কেঁদে আদায় করবে কিন্তু চুরি কখনও করোনা। ছোট ভাই বোনদের আদর করো। তাদের খাওয়াও, তাদের সঙ্গে খেলা করো। যেমন ভগবান রাম ভরত ও শত্রুঘ্নদের আদর করতেন, আদর

করে করে সব বোঝাতেন, সেই রকম তুমিও তোমার ভাই বোনদের সাথে মিলে মিশে থেকো, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করোনা। নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় তো ওদের কথা মেনে নিও। নিজের মত ওদের মানানর জন্য জিদ করোনা। পিতামাতার কথামত ঘরের কাজকর্ম করো। সময়ের অপচয় করো না, সময়কে ভাল কাজে লাগাও। অপরের প্রাপ্য অধিকার নষ্ট করো না। অপরের জিনিষ নিজের মনে করোনা। জিনিষ পত্রের সদ্ব্যবহার করো ইত্যাদি ইত্যাদি।" এইভাবে বাচ্চাদের যা যা শিক্ষা দেওয়া দরকার তাদের প্রত্যেক দিন ২/৩ বার করে বলে দাও। এর ফলে এই সব কথা ওদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে। এর অর্থ হল যে বালকদের এক তো সৎ আচরণ করে দেখান আর দ্বিতীয়তঃ ভাল ভাল শিক্ষা দেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে ভগবানের নিম্নলিখিত বানী মাতাপিতার মনন করা উচিৎ –

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাংকর্ম চেদহম্।
সংকরস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

(গীতা ৩/২২ – ২৪)

"হে পার্থ! এই তিনলোকে আমার না আছে কোনও কর্ত্তব্য না আছে কোনও প্রাপ্তব্য বস্তুর অপ্রাপ্ততা, তবুও আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মেই ব্যপৃত রয়েছি। যদি আমি কখনও অনবধানতা বশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করি তাহলে বড়ই ক্ষতি হয়ে যাবে ; কারণ মনুষ্য সব ব্যাপারে আমারই প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে। আমি যদি কর্ম না করি তবে সব মনুষ্য নষ্ট ও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর আমি হব বর্ণসঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সেই জন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব।

প্রঃ– আজকাল স্কুলের পরিবেশ খুব ভাল নয়, সুতরাং বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য কি করা উচিৎ ?

উঃ– বাচ্চাদের প্রতিদিন বাড়ীতে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ । ওদের এমন এমন সব গল্প বলা দরকার যে সব গল্পের মধ্যে এই শিক্ষা থাকবে যে যারা পিতামাতার আদেশ পালন করেছে তারা উন্নতি করেছে আর যারা পিতামাতার কথা শোনেনি তারা উচ্ছন্নে গেছে । ওরা যখন বই পড়তে শিখবে তখন ওদের ভক্তদের চরিত্রকাহিনী পড়তে দেওয়া উচিৎ । বাচ্চাদের বলা উচিৎ যে "বাছা ! সব রকম সঙ্গীদের সাথেই মেলামেশা করোনা, খুব বেশী মাখামাখি করে মিশো না । পড়াশুনার শেষে সোজা বাড়ীতে চলে এসো । বড়দের কাছে থাকবে । কিছু জিনিষ খাবার ইচ্ছা হবে তো মাকে বলে ঘরে তৈরী করিয়ে খেও, বাজারের জিনিষ খেও না, কারণ দোকানদারের উদ্দেশ্য হল পয়সা রোজগার, যাতে পয়সা বেশী পাওয়া যায়, তাতে জিনিষ যেমনই হোক না কেন । কাজেই সে খাবার জিনিষের মান ভাল করে না । ছোট বয়সে শরীরে জঠরাগ্নি তীব্র থাকাতে ওই সব কুখাদ্য তখন হজম ত হয়ে যাবে কিন্তু পরে এর কুফল ভবিষ্যৎ জীবনে বোঝা যাবে ।"

গৃহস্থের উচিৎ অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তার থেকে শিশুদের চরিত্র গঠনের দিকে বেশী নজর দেওয়া, কারণ উপার্জ্জিত অর্থ এই শিশুই পরে ভোগ করবে, কাজে লাগাবে । কিন্তু শিশু যদি মানুষ না হয় তবে ওই উপার্জ্জিত ধন শিশুকে অমানুষতার দিকেই নিয়ে যাবে । এই প্রসঙ্গে ভাল লোকেরা বলেন – "পুত্র সপুত তো কঁ্যাও ধন সঁচে ? পুত কপুত তো কঁ্যাও ধন সঁচে ?" অর্থাৎ পুত্র সুপুত্র হলে তার কখনও অর্থের অভাব হবেনা কিন্তু যদি কুপুত্র হয় তবে সমস্ত সঞ্চিত ধনই সে নষ্ট করে দেবে, তাহলে অর্থ সঞ্চয় করে কি হবে ।

প্রঃ– শিশুদের ইংরাজী স্কুলে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ কিনা ?

উঃ– শিশুদের ইংরাজী স্কুলে পড়ালে সে বাড়ীতে থেকেও বিজাতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষিত হয়ে উঠবে অর্থাৎ আপনার সন্তান উপরে

হিন্দু আর ভিতরে বিজাতীয় হয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার যে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এখানে এসে এরা আপনার সন্তানদের খ্রীষ্টান বানাচ্ছে আর আপনি নিজে ঘরে থেকেও নিজের বাচ্চাকে হিন্দু বানিয়ে রাখতে পারছেন না। শিশুরা আপনার দেশের নিজস্ব সম্পত্তি, দেশের ভবিষ্যৎ, এদের রক্ষা করো।

ধনী লোকদের উচিৎ যে নিজেদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ভাল নিয়ম কানুন থাকবে আর শিশুদের ভাল শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে পড়াবার শিক্ষকদেরও সচ্চরিত্র হতে হবে। যদিও সৎশিক্ষক পাওয়া কঠিন কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। এই সব স্কুল কলেজে নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ, গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থেরও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। ধার্মিক শিক্ষার জন্য এক ঘন্টা সময় ত নিশ্চয়ই রাখা দরকার।

আপনি নিজেও অনাড়ম্বরতা বজায় রাখুন আর শিশুদেরও সেটা শেখান। আপনি নিজে ভোজন বিলাসিতা, শৌখিনতা, আরাম- সুখ ত্যাগ করে ভাল ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন তা হলে শিশুদের ওপর এর ভাল প্রভাব পড়বে। বাড়ীতে ঠাকুর ঘর থাকা, ভগবানের পূজা হওয়া, ভগবানের চরণামৃত ছোট বড় সকলেই গ্রহণ করা, বাড়ীতে ভগবৎ সম্বন্ধীয় চর্চ্চা হওয়া, ভগবৎ নাম কীর্ত্তন হওয়া, ভাল ভাল কথাবিশিষ্ট গান হওয়া। আপনি নিজে যত ভাল হবেন, শিশুরাও ততটাই ভাল হবে। উপদেশের থেকে আচরনের মূল্য অনেক বেশী।

প্রঃ— পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য মাতা পিতার কি করণীয় ?

উঃ— আসল কথা হল এই যে পুত্র অথবা কন্যার যেমন ভাগ্য হবে, তাই হবে। তবুও মাতা পিতার কর্ত্তব্য হল যে পুত্রের বিবাহ দেবার সময় পাত্রীর স্বভাবটা দেখা উচিৎ, কারণ সারাজীবন তাকে নিয়ে চলতে হবে। পাত্রীর শরীরে কোনও ভয়ংকর রোগ না থাকে, তার মায়ের স্বভাব চরিত্র ভাল থাকে এই সব যতটা খোঁজ খবর করা সম্ভব করা দরকার। যদি কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয় তবে ঘর এবং বর যেন ভাল হয়, বরের যোগ্যতা যেন থাকে

এই সব বিষয় বিচার করে তবেই নিজের কন্যা দেওয়া উচিৎ । শাস্ত্রে বরের ব্যাপারে সাতটী বিষয় দেখার কথা বলা আছে –

কুলং চ শীলং চ বপুর্যশশ্চ বিদ্যাং চ বিত্তং চ সনাথতাং চ ।
এতান্ গুনান্ সপ্ত পরীক্ষ্য দেয়া কন্যা বুধৈঃ শেষমচিন্তনীয়ম্ ॥

"বরের কুল, শীল, স্বাস্থ্য, যশ, বিদ্যা, ধন, আর সহায়তা (ধনীমানী ব্যক্তিদের সহায়তা) – এই সাত গুনের পরীক্ষা করে নিজের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া উচিৎ ।" বাস্তবপক্ষে বর যদি ভাল হয় আর বরের মা যদি ভাল হয় তবে সেখানে কন্যা সুখে থাকে । মেয়েকে একেবারে কাছেও বিয়ে দিতে নেই আর বহুদূরেও বিয়ে দিতে নেই, কারণ কাছাকাছি থাকলে বিবাদ বিসংবাদ বেশী হতে পারে★ আর দূরে দিলে মেয়ের পক্ষে মা বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কঠিন হয়ে পড়ে ।

এর অর্থ হল যে সন্তান সুখী হয়, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, তার কোনও রকম কষ্ট না হয় আর বংশ বৃদ্ধি হয় – এইসব চিন্তা করে সন্তানের বিবাহ দেওয়া ।

প্রঃ– বিয়েতে পণ নেওয়া কি পাপ ?

উঃ– হ্যাঁ, পাপ ।

প্রঃ– যদি পাপই হয় তবে শাস্ত্রে এইরকম বিধান কেন দেওয়া আছে ?

উঃ– শাস্ত্রে কেবল পণ দেবার বিধান আছে, নেওয়ার বিধান নেই । পণ নেওয়া উচিৎ নয় আর না নেওয়ারই মহত্ত্ব বেশী । কারন পণ দেওয়া তো নিজের ইচ্ছা, কিন্তু পণ নেওয়া নিজের সামর্থ্যের ব্যাপার নয় ।

★কাছাকাছি বিয়ে দিলে মেয়ে তার প্রত্যেক দুঃখের কথা এসে মাকে বলবে, আর মেয়ের দুঃখ সইতে না পেরে মা মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের এমনসব কথাবার্ত্তা বলবে যাতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে । মেয়েরও উচিৎ যে সে তার দুঃখের কথা কাউকে না বলে, ঘরের কথা ঘরেই রাখে, তা না হলে তার নিজেরই সম্মানহানি হবে, তার ওপর এর প্রতিক্রিয়া হবে ; যেখানে তার রাতদিন থাকতে হবে সেখানে অশান্তি হয়ে যাবে ।

চাওয়া দু'রকমের হয় – (১) আমার জিনিস আমি ফিরে পাই – এই চাওয়া ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তিতে ওই চাওয়াও প্রতিবন্ধক। (২) অপরের জিনিস আমি পাই – এইরকম চাওয়া নরক প্রাপ্তির পথ। (এইরকমই পণ নেওয়ার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছা নরকে নিয়ে যায়)। পণ কম পাওয়া যায়, বেশী পাওয়া যায়, নাও পাওয়া যায় – সেটা ত প্রারব্ধের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু অন্যায়মত অপরের ধন নেওয়ার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছা ত ঘোর নরকে নিয়ে যাবার পথ। মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হয়ে ঘোর নরকে যাওয়া কত বড় লোকসান, কত বড় পতন! সুতরাং মানুষের অন্ততঃ ঘোর নরকে যাওয়ার ইচ্ছা, অপরের ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিৎ।

প্রকৃতপক্ষে অর্থপ্রাপ্তি প্রারব্ধ অনুসারেই হয়, ইচ্ছার দ্বারা হয় না। যদি অর্থপ্রাপ্তি নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত তাহলে কেউই নির্ধন থাকত না। অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছা কখনও কারুর পূর্ণ হয় না, আর হতে পারে না। ওই ইচ্ছাকে ত্যাগই করতে হবে। অর্থ প্রাপ্তির যদি যোগ থাকে তবে ইচ্ছা না করলেও সেই টাকা আপনি আপনি আসে, আর আকাঙ্খা থাকলে বাধা বিঘ্নের ভেতর দিয়ে পাপ অন্যায়ের মাধ্যমে সেই টাকা আসে। গীতাতে অর্জুন জিগ্যেস করেছেন যে মানুষ ইচ্ছা না করলেও কেন পাপকর্ম করে বসে? তাতে ভগবান উত্তর দেন যে কামনাই হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল (৩/৩৬-৩৭)।

আগেকার দিনে পণে পাওয়া শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রাপ্ত ধন বাইরেই ভাগ করে দেওয়া হত, ঘরের মধ্যে নেওয়া হতনা এবং 'অন্যের কন্যা দানরূপে নেওয়া হয়েছে' – এইজন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে যজ্ঞ, দান, ব্রাহ্মণভোজন, ইত্যাদি ক্রিয়া করা হত। কারণ অপরের কন্যা দান রূপে গ্রহণ করা বড় গুরুত্বপূর্ণ ঋণ। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কন্যা দান হিসাবে নিতেই হয়; তাই তাদের এইরকম ভাব থাকত যে আমার ঘরে কন্যা এলে আমিও কন্যা দান করব।

যে ব্রাহ্মণ বিধিবিধান অনুসারে গাভী ইত্যাদি দান গ্রহণ করে সেও তার জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে যজ্ঞ, গায়ত্রীজপ ইত্যাদি করে থাকে– এইরকম আমি দেখেছি। যখন অপরের অর্থ গ্রহণ করা নিন্দনীয় তখন

পণরূপে অর্থ গ্রহণ ত অধিক নিন্দনীয় । যদি কখনও পণ নেওয়া প্রয়োজনই হয় তাহলে কেবলমাত্র দাতার ইচ্ছাপূরণ ও তৃপ্তির জন্যই নেওয়া উচিৎ । নিজের একটুকুও নেওয়ার ইচ্ছা না থাকা এবং কেবলমাত্র দাতার তৃপ্তির জন্যই সামান্য কিছু গ্রহণ করা, এতে নেওয়াও দেওয়ারই সমান হয় ।

(৪) স্ত্রী – সম্পর্কিত আলোচনা

প্রঃ– কন্যা কি স্বয়ম্বর হতে পারে ?

উঃ– শাস্ত্রে স্বয়ম্বরের উল্লেখ আছে, কিন্তু যে স্বয়ম্বর হয়েছে সে কষ্টও পেয়েছে । সীতা,দ্রৌপদী, দময়ন্তী এরা স্বয়ম্বর হয়েছে কিন্তু এরা বেশীরভাগ দুঃখই পেয়েছে । আজকাল যে সব মেয়েরা স্বয়ম্বর হয়, নিজেরাই স্বামীদের খুঁজে নেয়, নিজের ইচ্ছা অনুসারে বিবাহ করে, তারা কোন্ সুখ পায় ? এরা কেবল দুঃখই পায়, অশান্তি, অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে মরে ।

যে মেয়ে স্বয়ম্বর হয় তার দায়িত্ব তার নিজের উপরই বর্ত্তায়। পিতা মেয়ের হিতৈষী,আর সেই হিত চিন্তা নিয়েই মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজে, তার সম্বন্ধস্থাপন করে; তাই সেই সম্বন্ধের দায়িত্ব পিতার ওপরই থাকে, মেয়ের ওপর নয় । পিতার দ্বারা স্থির করা সম্বন্ধের ব্যাপারে মেয়ের যদি কোথাও কোনও ক্রটীও হয় সেই ক্রটী নজরে পড়ে না ; কিন্তু স্বয়ম্বর হওয়া মেয়ের ক্রটী মার্জনা হয় না । যেমন পুত্র ত মাতাপিতার দ্বারা উৎপন্ন সন্তান, সে জেনেশুনে সম্বন্ধ স্থির করেনি । কিন্তু পালিত পুত্র যদি মাতাপিতার সেবা না করে তবে তার বিশেষ দন্ড পেতে হয় ; কারণ সে জেনেশুনে সম্বন্ধ পাতিয়েছে । কেউ যদি কারুর কাছে চাকরী করে আর চাকীরতে কিছু ক্রটি বিচ্যুতি হয় তাহলে তার ক্ষমা হয়না ; কারণ চাকরী সে নিজে স্বীকার করে নিয়েছে । তবে হ্যাঁ দয়ালু মালিক তাকে ক্ষমা করতে পারে কিন্তু সে ক্ষমার উপযুক্ত নয় । কেউ কাউকে তার গুরু করলে সেই গুরুর আজ্ঞা পালন করা তার বিশেষ দায়িত্ব হয় । যদি সেই গুরুর আজ্ঞা পালন না করে, গুরুকে তিরস্কার করে, নিন্দা করে তাহলে তাকে ভয়ংকর দন্ড পেতে হয় ।

তাকে ভগবানও ক্ষমা করতে পারেন না , ভগবান যদি ক্রুদ্ধ হন তাহলে গুরু তাকে সেই ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হলে ভগবানও তাকে রক্ষা করতে পারেন না । সুতরাং স্বয়ম্বর হওয়া মেয়ের ওপর তার নিজের বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় ।

প্রঃ– মেয়ে যদি বিবাহ না করে সাধনভজনেই জীবন কাটাতে চায় তাহলে সেটা কি ঠিক ?

উঃ– কোনও মেয়ের পক্ষে বিবাহ না করা উচিৎ নয়, কারন তার পক্ষে অবিবাহিতভাবে একলা থেকে জীবন কাটান খুব কঠিন ব্যাপার - অর্থাৎ বিবাহ না করে তার পক্ষে জীবন কাটানর ব্যাপারে বহু বিঘ্ন আসবে । যতদিন মা বাবা আছে ততদিন ত ঠিক আছে । কিন্তু যখন মা বাবা থাকবে না তখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইয়েরা (নিজেদের স্ত্রীর প্ররোচনায়) বোনের আদর করে না বরং সেই বোনকে গঞ্জনা দেয়, তাকে নীচ দৃষ্টিতে দেখে । ভাইয়ের বৌয়েরাও তাকে গঞ্জনা দেয় । এর ফলে মেয়ের মনে পরাধীনতার ভাব বদ্ধমূল হয়ে যায় । তাই বিবাহ করাই ভাল । আমি এমন স্ত্রীপুরুষও দেখেছি যারা বিবাহের পূর্বেই এরকম প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে যে আমরা বিয়ের পর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ না রেখে কেবল সাধনভজনেই জীবন কাটাব ; এবং নিজেদের প্রতিজ্ঞা রেখে জীবন কাটিয়ে গেছে । যদিও আজকের দিনে এরকম ছেলে পাওয়া কঠিন যে কেবল সাধন ভজনের জন্যই বিয়ে করে, তবুও সেরকম পাওয়া অসম্ভব নয় । মীরাবাঈয়ের মত যে শিশুকাল থেকেই ভজন-শরণে লেগে যায় তার কথা ত সম্পূর্ণই আলাদা ; কিন্তু এটা নিয়ম নয় ; এটা ভাব । এই ধারা প্রবাহেও বিঘ্ন আসে । মীরাবাঈয়ের জীবনেও বহু বিঘ্ন এসেছিল, কিন্তু ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তিতে তিনি সমস্ত বিঘ্নই পার হয়ে গিয়েছিলেন । এইরকম দৃঢ় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল । যার মনে এরকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তার জন্য এরকম নিয়মের প্রয়োজন পড়ে না, তা সে বিবাহ করুক বা না করুক । এর অর্থ হল যে ভগবানে দৃঢ় শ্রদ্ধা বিশ্বাস যার আছে সে যেখানেই থাকুক সে উৎকর্ষতা লাভ করবেই করবে ।

প্রঃ– স্ত্রীর পক্ষে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া কি উচিৎ ?

উঃ– পুরুষের ত এই অধিকার আছে যে তার যদি সংসারে বৈরাগ্য আসে তবে সে ঘর সংসার ত্যাগ করে, বিবাগী হ'য়ে ভজন-শরণে মন দেয়, কিন্তু নারীর জন্য এইরকম নির্দেশ আমি কোথাও দেখিনি। সুতরাং স্ত্রীর পক্ষে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া উচিৎ নয়। তার ত নিজের সংসারে থেকেই আপন কর্ত্তব্য পালন করা উচিৎ। সে যদি সংসারেই ত্যাগ এবং সংযমপূর্বক থাকে – তাতেই তার বেশী মহিমা। প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ বৈরাগ্যে যে তত্ত্ব আছে সাধু সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে সেই তত্ত্ব নেই। যার মধ্যে বিষয়ে আসক্তি নেই, সে সংসারে থেকেও সাধ্বী, সন্ন্যাসিনী।

প্রঃ– পতিব্রতা, সাধ্বী আর সতী কাকে বলে ?

উঃ– যদিও অভিধান অনুসারে পতিব্রতা, সাধ্বী আর সতী – তিন নামের একই অর্থ তবুও যদি তিনকে আলাদাভাবে বলা যায় তবে পতি জীবিত অবস্থায় যে নিজের নিয়মে দৃঢ় থাকে সে 'পতিব্রতা'; পতির মৃত্যুর পর যে রমণী নিজের নিয়মে, ত্যাগে দৃঢ় থাকে সে সাধ্বী; আর যে সর্বদা সত্যের পালন করে, যার পতির সঙ্গে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, যে পতির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে সতী হয়ে যায় সে "সতী"।

প্রঃ– সতীপ্রথা উচিৎ কি অনুচিত ?

উঃ– সতী হওয়া প্রথাই নয়। পতির সাথে চিতায় পুড়ে যাওয়াকে সতী হওয়া বলে না। যার মনে সৎ এসে যায়, প্রেরণা এসে যায় সে আগুন ছাড়াই জ্বলে যায়, আর তার পক্ষে পুড়ে যাওয়াতে কোনও কষ্টই হয় না। এটা এরকম কোনও নিয়ম নয় যে এই রকমই করতে হবে, বাস্তবিকপক্ষে এটাতো তার কাছে সত্য, ধর্ম, এবং শাস্ত্র মর্য্যাদার উপর বিশ্বাস।

হরদোই জিলায় ইকনোরা নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে একটি মেয়ে নিজের মামার বাড়ীতে থাকত। স্বামী রুগ্ন ছিল এবং পরে মরে যায়। তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ তার কাছে পৌছালে সে মামাকে জিজ্ঞেস করে যে সতী সুলোচনা, (ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত নারী যিনি পতির শব কোলে নিয়ে পতির চিতাগ্নিতে সতী হয়েছিলেন)

যদি পতির শবদেহ না পেত তাহলে সে কি করত ? মামা বলেন আমি কি করে বলব ? সে তখন বলে মামা, আমি সতী হব। মামা তাকে বলেন, না এরকম করা ঠিক নয়। সে তখন বলে আমি করব না, আমি হব। সে একটা প্রদীপ জ্বালায় আর তার উপরে নিজের আঙ্গুল রাখে, তাতে তার আঙ্গুল মোমবাতির মত জ্বলতে আরম্ভ করে। সে তখন মামাকে জিজ্ঞেস করে – আপনি আমাকে সতী হবার আজ্ঞা দিচ্ছেন কি না ? যদি না দেন তবে এখানে আপনার সমস্ত বাড়ী ভস্ম হয়ে যাবে। মামা তখন বলেন আচ্ছা তোর যেমন ইচ্ছা তাই কর। সে তখন জ্বলন্ত আঙ্গুলটী একটা দেওয়ালে ঘসে আগুনটা নিভিয়ে ফেলে এবং ঘরের বাইরে এক অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে মামাকে অনুরোধ করে বলে কাঠ দেবার জন্য। মামা বলে আমি তোমাকে না দেব কাঠ না দেব আগুন। ইতিমধ্যে গ্রামের লোক সেখানে সব জড় হয়ে যায় সে নিজে হাত জোড় করে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করল "হে নাথ, আপনি আমাকে আগুন দিন"। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটী ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি আপনি পুড়ে গেল। সেই আগুনে অশ্বত্থবৃক্ষের পাতাও পুড়ে যায়। এই ঘটনা গ্রামের সব লোক নিজের চোখে দেখেছে। এমন কি মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতে তারাও বলেছে যে ওই ঘটনা তাদের চোখের সামনে ঘটেছে। করপাত্রীজী মহারাজও সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি ওই দেওয়ালে কাল দাগ দেখে এসেছেন, যেখানে ওই মেয়েটি নিজের জ্বলন্ত আঙ্গুল ঘসে নিভিয়েছিল; সেই পুড়ে যাওয়া অশ্বত্থ গাছটীকেও তিনি দেখে এসেছেন।

এর অর্থ হল যে এটা সতীপ্রথা নয়। এটা তার নিজের ধার্ম্মিক প্রেরণা। এই বিষয়ে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী মহারাজ "সতীধর্ম হিন্দুধর্মের মেরুদন্ড" নামক বই* লিখেছেন, সেই বই পড়া উচিৎ।

প্রঃ– পতিব্রতার ভাব এবং আচরণ কি রকম হয় ?

---

*এই বই এর প্রাপ্তিস্থান-সংকীর্ত্তন ভবন, ধার্ম্মিক ট্রষ্ট, প্রতিষ্ঠানপুর (ঝুঁসী), এলাহাবাদ।

উঃ— তার মধ্যে ধার্ম্মিক ভাবের প্রবলতা হয় যার ফলে সে শরীর মন দিয়ে পতির সেবা করে । পতির মনের সাথে নিজের মন মিলিয়ে দেয়, নিজের বলে আলাদা কিছু রাখে না । তার মন সর্বদাই স্বামীর দিকে থাকে । তার এই পাতিব্রত ধর্মই তাকে রক্ষা করে ।

প্রায়ই পতিব্রতার সম্বন্ধ তার পূর্ব জন্মের পতির সাথেই হয় । কখনও কখনও এই রকমও হয় যে বাল্যকালে মেয়ের সৎশিক্ষা, সৎসঙ্গ পাওয়ার ফলে তার সৎ মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং বিবাহের পর সে পতিব্রতা হয়ে যায় ।

প্রঃ— পতিব্রতাকে কি করে চেনা যায় ?

উঃ— পতিব্রতার সংসারে সর্বদাই শান্তি বিরাজ করে আর সেই সংসারের সকলেই নিজের নিজের ধর্ম পালন করে থাকে । তার সন্তানও শ্রেষ্ঠ এবং মাতাপিতার ভক্ত হয় । পড়শীদের ওপর, সেই অঞ্চলের উপরও তার প্রভাব পড়ে ।

পতিব্রতাকে যে দর্শন করে তার মনের দুর্ভাব নষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু সব জায়গায় এই নিয়ম খাটে না, কারণ পতিব্রতার দর্শনে নিজের অন্তরের সুভাবই জাগ্রত হয় । যার মধ্যে ভাল ভাব, সংস্কার নেই তার উপরে পতিব্রতার তেমন প্রভাব পড়ে না । যেমন এক ব্যাধ দময়ন্তীকে অজগরের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল, কিন্তু দময়ন্তীর রূপ দেখে সে মোহিত হয়ে যায় আর তার মনে কুভাব জেগে ওঠে । দময়ন্তীর শাপে সে সেইখানেই ভস্ম হয়ে যায় । যুধিষ্ঠির বড় ধর্ম্মাত্মা, সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধনের ওপরে তার কোনও প্রভাবই পড়ে নি ।

প্রঃ— বর্তমান যুগে কি পাতিব্রত ধর্ম পালন করা সম্ভব ?

উঃ— পাতিব্রত ধর্ম পালন করার ব্যাপারে বর্তমান যুগে কোনও বাধা নেই । নিজের নিজের ধর্ম পালনের পক্ষে সকলের সর্বদাই অবাধ অধিকার আছে । ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করার ব্যাপারেই শাস্ত্র, ধর্ম, মর্য্যাদা ইত্যাদি অন্তরায় হয় ।

প্রঃ— পতি কি পত্নীকে ত্যাগ করতে পারে ?

উঃ– পত্নী যদি ভাল হয়, সুশীলা হয় কিন্তু রং কাল হয়, মায়ের সাথে তার বনিবনা না হয়, মায়ের কথা কখনও না শোনে এবং মা বলে যে একে ত্যাগ কর – এইরকম অবস্থায় যে পত্নীকে ত্যাগ করে, সে মহাপাপ করে, ঘোর অন্যায় করে, সুতরাং সে ঘোর নরকে যায় । আধুনিক ছেলেরা স্ত্রীকে দোষী মনে করে তাকে ত্যাগ করে কিন্তু তারা নিজেরা কি সব সময় গঙ্গাজলে ধোওয়া ! সুতরাং পত্নীকে কখনও ত্যাগ করা উচিৎ নয় ।

প্রঃ– যদি পত্নী দুশ্চরিত্রা বা ব্যাভিচারিণী হয় তবে তাকে ত্যাগ করা উচিৎ কিনা ?

উঃ– আধুনিক যুগে যতক্ষণ পারা যায় তাকে ত্যাগ না করাই উচিৎ । নিজের শক্তি অনুসারে তাকে শাসন করা চাই, তাকে শোধরাবার চেষ্টা করা দরকার । যদি তাকে শাস্তি দিতেই হয় তবে তার সাথে কথাবার্ত্তাই না বলা আর তার রান্না করা খাদ্য না খাওয়া ।

প্রঃ– এই কথা কি সত্য যে পতির অর্দ্ধেক পুণ্য পত্নী পায় আর পত্নীর অর্দ্ধেক পাপ পতি পায় ?

উঃ– পত্নী নিজের মাতা পিতা, ভাই বোন সব ত্যাগ করে নিজের ঘর ত্যাগ করে আসে আর ত্যাগ থেকেই পুণ্য হয় । সে নিজের গোত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করে পতির মনের সাথে নিজের মন মিলিয়ে দেয় । সুতরাং সে পুণ্যের ভাগীদার । পতি সন্ধ্যা গায়ত্রী ইত্যাদি পালন করে আর তার অর্দ্ধেক ফল (পুণ্য) পত্নী পায় । এইজন্য পতির পৈতা – এক নিজের আর দ্বিতীয় পত্নীর ।

মেয়েদের শৈশবে শিক্ষা মাতাপিতা, ভাই ইত্যাদির কাছে হয় আর বিবাহের পর শিক্ষা পতির কাছে হয় । যদি পতির কাছে ঠিকমত শিক্ষা না পাওয়ার দরুণ পত্নী পাপাচারণে প্রবৃত্ত হয় তবে সেই পাপের অর্দ্ধেক পতির ভাগ্যে যায় । আর যদি পতি সুশিক্ষা দেয় এবং পত্নী পতির আদেশ গ্রাহ্য না করে এবং পাপ আচরণে প্রবৃত্ত থাকে তবে সেক্ষেত্রে পত্নীর অর্দ্ধেক পাপ পতির লাগেনা, কারণ সেখানে পত্নী তার নিজের দায়িত্ব তার নিজের ওপরেই নিয়েছে । এই রকমই যেই পত্নী

পতির নির্দ্দেশ মেনে চলে, পতির অধীন থাকে সে পতির অর্দ্ধেক পুণ্যের ভাগীদার হয় । যে পতির নির্দ্দেশ মেনে না চলে সে পতির অর্দ্ধেক পুণ্যের ভাগীদার হয় না ।

প্রঃ— বিধর্মীরা যদি কোনও স্ত্রীলোককে অপহরণ করে নিয়ে যায় তবে সেই স্ত্রীলোককে কি করা উচিৎ ?

উঃ— যতটা পারা যায় তার সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এবং সুযোগমত সেখানে থকে পালিয়ে আসা উচিৎ । কোনটাই যদি সম্ভব না হয় তাহলে ভগবানকে ডাকা দরকার ! ভগবান কোনও না কোনও রকমে ঠিক ছাড়িয়ে দেবেন । একজন মহিলাকে মুখে কাপড় বেঁধে, হাত দু'টোকে পিছমোড়া বাঁধন দিয়ে, বোরখা পরিয়ে বিধর্মীরা রেলে করে নিয়ে যাচ্ছিল । লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে যখন টি টি টিকিট দেখবার জন্য মহিলার সামনে এসে দাঁড়ান তখন সেই মহিলা নিজের পা দিয়ে টি টি-র পা চেপে দিল । টি টি ভাবল যে এই মহিলা আমার পা চাপল কেন ? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু রহস্য আছে ! সে রেলের পুলিশকে ডেকে নিয়ে এল ! পুলিশ এসে ব্যাপার বুঝে মহিলাকে ছাড়িয়ে নেয় আর অপহরণকারীকে ধরে নিয়ে যায় । এই রকমই নোয়াখালিতে বিধর্মীরা একজন মহিলাকে অপহরণ করে । সেই মহিলা আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে । এমন সময় আর একজন বিধর্মী এসে পড়ে আর বলতে থাকে যে আমি একে বিয়ে করব । এই কথা নিয়ে দুই বিধর্মী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থেকে মারামারি এবং খুনোখুনি করে দু'জনেই মরে যায় আর ওই মহিলা রক্ষা পেয়ে যায় ।

প্রঃ— যার পত্নীকে বিধর্মীরা নিয়ে গেছে তার কি কর্ত্তব্য ?

উঃ— সেই পুরুষের যদি তাকে ফিরিয়ে আনার সামর্থ্য থাকে এবং সেই পত্নী যদি খুসীমনে ফিরে আসতে চায় তবে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসা উচিৎ । কারণ সেই স্ত্রীর সঙ্গে জবরদস্তি করা হয়েছে সুতরাং সে একপতিব্রতকে রক্ষা করতে পারেনি কিন্তু তার ধর্ম হানি হয়নি । ধর্ম কেবল নিজে তার নিজের ইচ্ছায়ই ছাড়লে তবে ত্যাগ হয় । জোর করে অত্যাচার করে কেউ কারুর ধর্মত্যাগ করতে

পারে না। তাকে ধর্মভ্রষ্ট করতে পারে না। যদি কেউ জোর করে কারুর মুখে গোমাংসও দেয় তাহলে সে তার ধর্ম ছাড়াতে পারে না। সুতরাং যদি সেই মহিলা মন থেকে ধর্ম না ছাড়ে, সে যদি আনন্দের সাথে সঙ্গসুখ না উপভোগ করে থাকে তবে তার পাতিব্রতধর্ম নষ্ট হয় নি। কাজেই সে যদি ফিরে আসে তবে তাকে গীতা, রামায়ণ, ভাগবৎ ইত্যাদি পাঠ দ্বারা এবং গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া উচিৎ। এর পরে যখন সে রজস্বলা হবে তার পরে সে সর্বপ্রকারে শুদ্ধ হয়ে যাবে – **"রজসা শুদ্ধয়তে নারী।"**

জামদগ্নি ঋষির পত্নী রেনুকা প্রতিদিন তার পাতিব্রত ধর্মের শক্তিতে কাপড়ে জল ভরে নিয়ে আসত। একদিন নদীর ধারে সে হঠাৎ সোনার মত চকচকে এবং সুন্দর চুল দেখতে পায়। এই দেখে তার মনে হল যে এই চুলই যখন এত সুন্দর তখন যার এই চুল সেই পুরুষ না জানি কত সুন্দর হবে। মনে এইরকম বিকার আসাতেই তার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল এবং আগের মত সে আর কাপড়ে জল ভরে আনতে পারল না।

ইন্দ্র গৌতম ঋষির রূপ ধারণ করে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করে কিন্তু তাতে অহল্যার ধর্ম নষ্ট হয়নি অবশ্য একপতিব্রত নষ্ট হয়েছিল। যদিও পতি এসে ক্রোধবশে তাকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিল, তবুও ভগবান রাম এসে তাকে উদ্ধার করেছিল ; কারণ সে নিজ ধর্মে অটল ছিল।

গীতাপ্রেসের স্থাপয়িতা শ্রীজয়দয়ালজী গোয়েন্দকা শুদ্ধি এবং পবিত্রতার ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন। তিনিও বলেছিলেন যে বিধর্মীরা জোর করে যে নারীর সতীত্ব নষ্ট করে সেই নারী ধর্মভ্রষ্টা হন না। সে যদি হিন্দু ধর্মে আসতে চায় তবে তাকে গ্রহণ করা উচিৎ এবং গঙ্গাস্নান, গীতা রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া উচিৎ। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে অন্য কোনও ধর্মে বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তি যদি হিন্দুধর্মে আসতে চায় তবে তাকে গ্রহণ করা উচিৎ, সেও হিন্দু হতে পারে এবং হিন্দুধর্মের পদ্ধতি অনুসারে জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ ইত্যাদি করতে পারে।

প্রঃ— পত্নী যদি নিজের ইচ্ছায় কোথাও চলে যায় এবং পরে আবার ফিরে আসে তবে তাকে কি করা উচিৎ ?

উঃ— তাকে নিজের পত্নীত্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিৎ নয়, তার সঙ্গে পত্নীর মত ব্যবহার করা উচিৎ নয় । যেমন মহাত্মা কুবাজী মহারাজের পত্নী তাকে ছেড়ে অন্যের কাছে চলে গিয়েছিল । সেখানে যাওয়ার পর সে সন্তান জন্মও দিয়েছে । কিন্তু তার সেই স্বামী মরে যায় । তখন তার পক্ষে জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে । সুতরাং সে অবার কুবাজীর কাছে ফিরে আসে । কুবাজী তাকে তার জীবন ধারণের,ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেন কিন্তু নিজের পত্নীত্বের স্বীকৃতি দেননি ।

প্রঃ— পতি যদি দুশ্চরিত্র হয় তবে পত্নীর কি করা উচিৎ ?

উঃ— দুশ্চরিত্র পতিকে পত্নীর ত্যাগ করা উচিৎ নয় বরং নিজের পাতিব্রতধর্ম পালন করতে থেকে সেই স্বামীকে বোঝান দরকার । যেমন মন্দোদরী রাবণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু রাবণকে ত্যাগ করে নি ।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষ দু'জনেই পরস্পরের কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ হয় । সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী পতিকে পরামর্শ দেওয়া, পতিকে নিজের মনের কথা বলা এসব পত্নীর বিধিসম্মত অধিকার । গান্ধারী কত উচ্চকোটীর পতিব্রতা ছিলেন যে তিনি যখন শুনলেন যে যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে অন্ধ তখন সেও নিজের চোখে কাপড় বেঁধে নিল ; কারণ দৃষ্টির যে সুখ তার পতির নেই সেই সুখ তার নিজেরও উপভোগ করা উচিৎ নয় । যখন প্রয়োজন পড়েছে তখন সেও স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে তার পক্ষে দুর্যোধনের প্রস্তাব স্বীকার করা উচিৎ নয় কারণ তাতে কুল নষ্ট হয়ে যাবে । এই পরামর্শ সে কয়েকবারই দিয়েছে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তার পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যার ফলে বংশ ধ্বংস হয়ে গেল । এর অর্থ হচ্ছে যে স্বামীকে শুভ পরামর্শ দেবার পূর্ণ অধিকার স্ত্রীর রয়েছে । শাস্ত্রে আছে যে যে স্ত্রী মনেপ্রাণে স্বামীকে সেবা করে, নিজের ধর্ম পালন করে, সে মৃত্যুর পর পতিলোকে

(স্বামীর কাছে) যায়। আর যদি স্বামী দুশ্চরিত্র হয় তবে স্বামীর গতি হয় নরকে ; সুতরাং পতিব্রতা স্ত্রীর গতিও নরকে হওয়া উচিৎ ! কিন্তু পতিব্রতা নারী নরকে যেতে পারে না ; কারণ সে শাস্ত্রের, ভগবানের, সন্তমহাত্মাদের নির্দেশ পালন করেছে, পাতিব্রত ধর্মের পালন করেছে। সুতরাং সে তার নিজের পাতিব্রত ধর্মের জোরে স্বামীকে উদ্ধার করে দেবে অর্থাৎ পত্নীর যে লোকে গতি হবে স্বামীরও সেই লোকেই গতি হবে। এর অর্থ হচ্ছে যে নিজের কর্তব্য পালনকারী মানুষ অপরকে উদ্ধার করবার শক্তি অর্জন করে।

প্রঃ– আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের জন্য উৎসাহ দেয় তবে কি করা উচিৎ ?

উঃ– স্বামীর সেই অধিকার নেই যার জোরে সে নিজের স্ত্রীকে অপরকে দিয়ে দেয় ; কারণ স্ত্রীর পিতা তার কন্যাকে সেই স্বামীর হাতেই দান করেছেন। ভাত কাপড় দান গ্রহণকারী ত সেই গৃহীত বস্তু অন্যকে দিতে পারে কিন্তু কন্যাদান গ্রহণকারী পতি নিজের পত্নীকে অপরকে দিতে পারে না। সে যদি এরকম করে তবে মহাপাপের ভাগী হয়। এইরকম অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর আদেশ কোনমতেই পালন করা উচিৎ নয়। নিজের স্বামীকে পরিস্কার বলে দেওয়া উচিৎ যে আমার পিতা আপনার কাছেই তাঁর কন্যাদান করেছেন ; সুতরাং অপরকে দেবার অধিকার আপনার নেই। এই বিষয়ে সে আদেশ অমান্য করলে তাতে তার কোনও অন্যায় হয় না, কারণ স্বামীর ওই নির্দেশ অন্যায়কে সমর্থন করা, অন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দেওয়ারই সমতুল। এটা সকলের পক্ষেই অনুচিত। এছাড়া স্ত্রী যদি স্বামীর ধর্মবিরুদ্ধ আজ্ঞা পালন করে তাহলে এই পাপের দরুণ স্বামীর নরকে গতি হবে। সুতরাং পত্নীর পক্ষে এরকম আজ্ঞা পালন না করাই উচিৎ, যাতে পতির নরকে গতি হয়।

আর যদি পতি নিজেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্ত্রীসম্ভোগ করে তবে অন্যায় এবং পাপাচারণ করে। ধর্মসম্মত কাম ভগবানের স্বরূপ – **"ধর্মাবিরুদ্ধো ভুতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥"** (গীতা ৭/১১); সুতরাং এতে দোষ বা পাপ নেই। কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে নারীকে নিজের

ইচ্ছামত উপভোগ করা অন্যায় । মানুষের পক্ষে সর্বদা শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা অনুযায়ীই প্রত্যেক কর্ম করা উচিৎ (গীতা ১৬/২৪)।

প্রঃ— স্বামী যদি মদ্য মাংসে আসক্ত থাকে তবে স্ত্রীর কি করণীয় ?

উঃ— স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিষিদ্ধ আচরণ ত্যাগ করান দরকার । কিন্তু স্বামী যদি না শোনে তবে কিছু করার নেই তবুও স্বামীকে বোঝান স্ত্রীর ধর্ম এবং অধিকার । স্ত্রীর নিজের খাদ্য পানীয় শুদ্ধই রাখা উচিৎ ।

প্রঃ— স্বামী যদি মারপিট করে, কষ্ট দেয় তাহলে স্ত্রীর কি করা উচিৎ ?

উঃ— স্ত্রীর নিজের মনে এইরকম সান্ত্বনা দরকার যে আমার পূর্ব জন্মের কোনও প্রতিশোধ আছে, ঋণ আছে যা এইভাবে শোধ হচ্ছে ; এতে আমার পূর্বকৃত পাপই ক্ষয় হচ্ছে এবং আমি শুদ্ধ হচ্ছি । মার খাওয়ার সংবাদ বাপের বাড়ীর লোকেরা জানতে পারলে, তারা এসে তাকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে ; কারণ তাকে মারপিট করার জন্য তারা তাদের মেয়ে দেয় নি ।

প্রঃ— যদি বাপের বাড়ীর লোকেরাও তাকে তাদের বাড়ীতে না নিয়ে যায় তবে সেই নারী কি করবে ?

উঃ— তাহলে ত তাকে নিজের পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, এছাড়া বেচারী কিই বা করতে পারে ! ওর স্বামীর মারপিট ধৈর্য্য ধরে সহ্য করাই উচিৎ । সহ্যের ফলে পাপ কেটে যাবে আর ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে যে স্বামী নিজের থেকেই ভাল ব্যবহার করবে । যদি স্বামীর প্রহার সহ্য না করতে পারে তাহলে স্বামীকে বলে তার আলাদা হয়ে যাওয়া উচিৎ এবং আলাদা থেকে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের ভজন পূজন স্মরণের মধ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ । পুরুষের পক্ষে কখনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা উচিৎ নয় । শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর জন্যই জন্মেছিলেন ; কিন্তু তিনি যখন যুদ্ধে ভীষ্মের সামনে

আসতেন তখন ভীষ্ম ধনুর্বান ত্যাগ করতেন। কারণ শিখণ্ডী পূর্বজন্মে স্ত্রীলোক ছিলেন এবং এই জন্মেও স্ত্রীরূপেই জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তার পুরুষত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং ভীষ্ম তাঁকে স্ত্রীলোক হিসাবেই গণ্য করেন এবং তার ওপর শর বর্ষন করেন নি।

কোনও না কোনও পাপের জন্যই জীবনে বিপত্তি আসে। সেই সময় দৃঢ়সংকল্পে ভগবানের ভজন পূজন করলে দ্বিগুণ লাভ হয়। এক তো পাপ কেটে যায়, আর ভগবানকে ডাকলে ভগবৎ বিশ্বাস বেড়ে যায়। কাজেই বিপদ এলে নারীর ধৈর্য্য এবং শক্তি হারান উচিৎ নয়। বিপদ এলে আত্মহত্যা করার চিন্তাও মনে আনা উচিৎ নয় ; কারণ আত্মহত্যা করলে খুব গুরুতর পাপ হয়। কোনও মানুষকে হত্যা করলে যে পাপ হয় আত্মহত্যা করলেও সেই পাপই হয়। মানুষ মনে করে যে আত্মহত্যা করলে আমার দুঃখেরও শেষ হয়ে যাবে ; আমি সুখী হয়ে যাব। এ নিতান্ত মূর্খতার কথা ; কারণ যে পাপের জন্য বিপদ এল সেই পাপও কাটল না আবার আত্মহত্যার জন্য নতুন পাপের সৃষ্টি হল ! যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে কিন্তু বেঁচে গেছে, তার কাছ থেকে জানা গেছে যে আত্মহত্যার সময় ভীষন কষ্ট হয় আর অনুতাপ হয় যে এটা না করলেই হত, কিন্তু এখন আর কি করা ? আত্মঘাতী ব্যক্তি প্রায়ই ভূত প্রেত যোনিতে গতি পায় এবং সেখানে ক্ষুৎ পিপাসায় দুঃখ পায়। এর অর্থ হল যে আত্মঘাতী ব্যাক্তির বড়ই দুর্গতি হয়।

প্রঃ– যদি স্বামী কোনও স্ত্রীকে ত্যাগ করে দেয় তবে তার কি কর্ত্তব্য ?

উঃ– তার নিজের পিতার কাছে থাকা উচিৎ। পিতার বাড়ীতে যদি থাকা সম্ভব না হয় তবে শ্বশুরবাড়ী অথবা বাপের বাড়ীর কাছাকাছি কোনও ঘর ভাড়া করে সেখানে থাকা আর সম্মান, সংযম, ব্রহ্মচর্য্যপূর্বক নিজ ধর্ম পালন করা, এবং ভগবানের ভজন পূজনে ব্যস্ত থাকা। পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তাই দিয়ে নিজের জীবন নির্বাহ করা। আর যদি হাতে টাকা পয়সা না থাকে তাহলে ঘরে বসে নিজের হাতে হস্তশিল্পের কাজ করা। সেলাই ফোঁড়াই

কিন্তু তপস্যায় কষ্ট ত হয়েই থাকে, আরাম হয় না । এই তপস্যায় তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে এবং তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ।

মাতাপিতা, ভাই ভ্রাতৃবধু এদের বিশেষ খেয়াল রাখা উচিৎ যে বোন মেয়ে এরা ধর্মের প্রতিরূপ ; অতএব এদের ভরণ পোষণে খুব পূণ্য হয় । তাদের এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিৎ – **"বিপত্তি কাল কর শতগুন নেহা"** (মানস, কিষ্কিন্ধ্যা ৭/৩) অর্থাৎ বিপদের সময় মেয়ে বোনকে শতগুন স্নেহ করা । যদি তারা এটা না করতে পারে তবে সেই মেয়ের এইরকম চিন্তা করা উচিৎ যে জঙ্গলে বাসকারী প্রাণীদেরও ভগবান পালন পোষণ করেন, আর তিনি কি আমার পালন পোষণ করবেন না ! সকলের মালিক ভগবান থাকা সত্ত্বেও আমি কেমন করে অনাথ হতে পারি ! এই চিন্তাকে মনে মনে অটলভাবে রেখে ভগবানের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকা উচিৎ, নির্ভয়, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত এবং নিঃশঙ্ক থাকা উচিৎ । একজন বিধবা বোন ছিল । তার কোনও সম্বল ছিল না । শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তার গয়নাও নিয়ে নিয়েছিল । সে বলত কি যে আমার কোনও চিন্তাই নেই । দুটো হাতের পিছনে একটা পেট, সুতরাং চিন্তা কিসের ! মেয়েদের শিশু বয়স থেকেই হস্তশিল্পাদি, সেলাই ফোঁড়াই, লেখাপড়া শেখানো এইসব শিখে রাখা দরকার । বিবাহের পর স্বামীর সেবায় কোনওরকম ত্রুটী না করা, কিন্তু অন্তরে অন্তরে নির্ভরতা ভগবানের উপরই রাখা উচিৎ । আসল সহায় ভগবান । এই সহায় না স্বামী, না পুত্র এমনকি নিজের শরীরও নয় – এটা এক্কেবারে অতি সত্য কথা । সুতরাং স্বামী যদি ত্যাগ করে দেয় তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই ব্যাপারে যদি নিজের কোনও ত্রুটি থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তা সুধরে নেওয়া উচিৎ; আর যদি কোনও ত্রুটি না থাকে তবে একেবারে নিশ্চন্ত থাকা উচিৎ । নিজের চিন্তা এবং আচরণ যদি ঠিক না থাকে তবেই মনে ভয়ের উৎপত্তি হয় । নিজের চিন্তা এবং আচরণ যদি খাঁটী থাকে তবে মনে কখনই সংশয় উদয় হবে না । সুতরাং নিজের চিন্তা এবং আচরণ

সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র রেখে ভগবানের ভজন পূজন করা উচিৎ । ভগবানের ওপর নির্ভরতার ব্যাপারে অন্য কোনও চিন্তারই প্রশ্রয় না দেওয়া ।

আধুনিক যুবকদের উচিৎ যে তারা যেন স্ত্রীদের ত্যাগ না করে । স্ত্রীকে ত্যাগ করা মহাপাপ, অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় । এই কর্ম তাকে ভয়ঙ্কর নরকে নিয়ে যায় ।

প্রঃ– পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে কি না ?

উঃ– যদি প্রথম স্ত্রী থেকে সন্তান না হয় তাহলে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, কেবল সন্তান প্রজননের জন্য পুরুষ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে । শুধুমাত্র সুখ সম্ভোগের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা নিষেধ ; কারণ এই মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি সুখ সম্ভোগের জন্য নয় ।

পুনর্বিবাহ প্রথমা পত্নীর আজ্ঞা এবং সম্মতি নিয়েই করা উচিৎ এবং পত্নীরও উচিৎ যে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য সে পুনর্বিবাহের আজ্ঞা দেয় । পুনর্বিবাহ করলেও স্বামীর তরফ থেকে প্রথমা পত্নীর অধিকার সুরক্ষিত রাখা উচিৎ ; তাকে কটু কথা বলা বা অনাদর কখনই করা উচিৎ নয়, বরং তাকে জ্যেষ্ঠার সম্মান দিয়ে পতি এবং দ্বিতীয়া পত্নী দুজনেরই তাকে সম্মান দেওয়া উচিৎ ।

যার সন্তান হয়ে গেছে কিন্তু স্ত্রী মরে গেছে তার দ্বিতীয় বিবাহ করার কোনও প্রয়োজনই নেই ; কারণ সে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে । কিন্তু যার ভোগতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি, সে পুনর্বিবাহ করতে পারে ; কারণ সে যদি পুনর্বিবাহ না করে তবে সে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে । বেশ্যাগামী হয়ে যাবে এবং এতে তার ভয়ঙ্কর পাপ হবে । সুতরাং এই পাপ থেকে বাঁচার জন্য সম্মানের সঙ্গে বাঁচার জন্য তার পক্ষে শাস্ত্র সম্মতভাবে পুনর্বিবাহ করে নেওয়া প্রয়োজন ।

প্রঃ– আগের দিনে রাজারা বহু বিবাহ করতেন এটা কি উচিৎ ছিল ?

উঃ— যেই সব রাজারা নিজেদের সম্ভোগসুখ চরিতার্থের জন্য বহু বিবাহ করতেন তাদের আদর্শ রাজা বলা যায় না। কেবল রাজা হলেই কেউ আদর্শ হয় না। যে শাস্ত্র নিয়ম অনুসারে চলে, ধর্মের পথে চলে, সেই রাজাকেই আদর্শ বলা হয়। বাস্তবিকপক্ষে বিবাহ করা খুব একটা মহৎ কাজ নয় আর তার নিতান্ত আবশ্যকতাও নেই। প্রয়োজন ত পরমাত্মাপ্রাপ্তি। এর জন্যই মনুষ্য শরীরের প্রাপ্তি, বিবাহের জন্য নয়। স্ত্রী ও পুরুষের সম্ভোগ তো দেবতাদের থেকে নিয়ে ভূত-প্রেত ইত্যাদি এবং স্থাবর জঙ্গম সব যোনিতেই হয়ে থাকে ; কাজেই সেটা একটা খুব মহৎ ব্যাপার নয়। কিন্তু পরমাত্মপ্রাপ্তির সুযোগ, অধিকার, যোগ্যতা ইত্যাদি ত একমাত্র মনুষ্য জন্মেই আছে। মানব শরীর পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্মগত অধিকারী। যে সব মানুষ নিজেদের বিচার বিবেচনা দ্বারা নিজের বিষয়-আসক্তি, ভোগাসক্তি ত্যাগ করতে পারে না এইরকম দুর্বলচিত্ত মনুষ্যের জন্যই বিবাহের বিধান। যাতে করে ভোগের চরম সুখ উপভোগ করে তাতে বিরক্তি, তাতে অরুচি আসবে এইজন্যই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা। যে বিষয়াসক্তি ছাড়তে পারেনা তার ওপরেই পিতৃঋণ থাকে অর্থাৎ উপকুর্বান ব্রহ্মচারীর ওপরই বংশপরম্পরা প্রবাহিত রাখার দায়িত্ব থাকে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং ভগবৎভক্তের ওপর এ দায়িত্ব থাকেনা। এর অর্থ হল এই যে পিতৃঋণ সেই ব্যক্তির ওপরই থাকে, যার ভোগাসক্তির নিবৃত্তি হয়নি। যার ভোগে আসক্তি নেই তার ওপরে কোনও ঋণ থাকেই না, সে কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী যাই না কেন হোন। কারণ পয়সা রোজগারের ওপরই ট্যাক্স লাগে, সম্পত্তির ওপরই কর দিতে হয়। যার রোজগারই নেই, তার জন্য ট্যাক্স কিসের ওপর ? সম্পত্তিই নেই ত কর কিসের জন্য ?

প্রঃ— নারীর পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ কি নিষিদ্ধ ?

উঃ— মাতাপিতা যখন কন্যাদান করে দিয়েছে তখন তার আর কন্যা নাম রইল না ; সুতরাং তাকে আবার দ্বিতীয়বার দান কি করে সম্ভব হয় ? এরপরে যদি পুনর্বিবাহ করতে হয় তবে সেটা পশুধর্ম হয়ে গেল

সকৃদংশো নিপততি সকৃতকন্যা প্রদীয়তে ।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীন্যেতানি সতাং সকৃৎ ।
(মনুস্মৃতি ৯/৪৭ ; মহাভারত বন : ২৯৪/২৬)

পরিজনদের মধ্যে ধনসম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা একবারই হয়, কন্যা একবারই দান করা যায় এবং **"আমি দেব"**- এই প্রতিজ্ঞাও একইবার করা যায় । সৎলোকের পক্ষে এই তিন কাজ একবারই করা যায় । শাস্ত্রীয়, ধার্মিক, শারীরিক আর ব্যবহারিক – চার দৃষ্টিকোন থেকেই স্ত্রীলোকের পক্ষে পুনর্বিবাহ করা অনুচিৎ । শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে দেখলে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদের পুনর্বিবাহের কোনও সম্মতি নেই । ধার্মিক দৃষ্টিতে দেখলে স্ত্রীলোকের ওপর পিতৃঋণ ইত্যাদি কোনওরকম ঋণই নেই । শারীরিক দৃষ্টিতে দেখলে কামশক্তিকে দমন করবার একরকম ক্ষমতা একরকম মনোবল স্ত্রীলোকের মধ্যে আছে । ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখলে পুনর্বিবাহ করলে সেই নারীর পূর্বের সন্তান কোথায় যাবে ? তার ভরণপোষণ কে করবে ? কারণ এই নারী যার সঙ্গে বিবাহিত হবে সে ওই সন্তানকে স্বীকার করবে না । সুতরাং নারীজাতির উচিৎ যে পুনর্বিবাহ না করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এবং সংযমতার সঙ্গে জীবন নির্বাহ করে ।

শাস্ত্রে তো এই পর্য্যন্তও বলেছে যে যেই নারীর পাঁচ সাতটি সন্তান আছে, সে যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তবে সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গতি প্রাপ্ত হয় । আর যার সন্তান নেই সে যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তার পক্ষে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গতি প্রাপ্ত হওয়া আর এমন কি ব্যাপার ?

প্রঃ– যদি যুবতী নারী বিধবা হয়ে যায় তবে তার কি করা উচিৎ ?

উঃ– জীবিত অবস্থায় পতি যে সব জিনিস ভাল মনে করতেন আর যে সব ব্যাপার তার মনমত ছিল, তার মৃত্যুর পরেও বিধবা স্ত্রীর সেই অনুসারে চলা উচিৎ । তার এই রকম চিন্তা করা উচিৎ যে ভগবান যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে ফেলেছেন, সেটা আমার কাছে তপস্যাস্বরূপ । স্বেচ্ছা-তপস্যার থেকে এই তপস্যা অনেক শ্রেষ্ঠ ।

ঈশ্বর প্রদত্ত পরিস্থিতিতে পালন করা তপস্যা, সংযম ইত্যাদির মাহাত্ম্য অনেক বেশী। এইরকম ভাবনা মনে রেখে সর্বদা জোর রাখা দরকার যে আমি কি সৌভাগ্যশালী যে ভগবান আমাকে এরকম তপস্যা করবার সুযোগ দিয়েছেন। ভাগবতে আছ –

তত্তেনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তি পদে স দায়ভাক্॥

যে ব্যক্তি প্রতিক্ষণে উৎসাহভরে আপনার কৃপাকে সঠিকভাবে অনুভব করতে থাকে এবং প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত সুখ বা দুঃখকে অম্লানবদনে ভোগ করে এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, গদ গদ বাণীতে ও পুলকিত শরীরে নিজেকে আপনার চরণে সমর্পিত করতে থাকে – এইরকম ভাবে যে জীবন অতিবাহিত করে সে ঠিক সেইরকম ভাবেই আপনার পরম পদের অধিকারী যেমন ভাবে পুত্র তার পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়।

বিধবা নারীর পক্ষে নিজের চরিত্র বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিৎ, কারণ যদি সে ব্যাভিচারিণী হয় তাহলে সে নিজের উভয় কুলকেই কলঙ্কিত করে, সম্মানের বিনাশ করে আর মৃত্যুর পর ঘোর নরকে যায়। অতএব তার নিজের মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা উচিৎ, ধর্মবিরুদ্ধ কোনও কর্ম করা উচিৎ নয়। মাতা কুন্তীর মতোই তার নিজ বৈধব্য ধর্ম পালন করা উচিৎ। মাতা কুন্তীকে স্মরণ করলে নিজের ধর্ম পালনের মনোবল বাড়ে।

প্রঃ– আজকাল নারী জাতির পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের হাওয়া চলছে, এটা কি ঠিক ?

উঃ– এটা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর সমান অধিকার নেই, বরং বিশেষ অধিকার আছে! কারণ সে নিজের পিতামাতার সংসার ছেড়ে স্বামীর সংসারে এসেছে ; সুতরাং এই সংসারে তার বিশেষ অধিকার আছে। বৌ ঘরের কর্ত্রী এইজন্য বৌরানী বা বৌমা বলা হয়। বাইরে স্বামীর বিশেষ অধিকার থাকে। যেমন রথ দুই চাকায় চলে, কিন্তু দু'টো চাকাই আলাদা অলাদা। যদি দু'টো চাকাকে এক

সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে রথ কিভাবে চলবে ? যেমন দু'টো চাকা আলাদা হলে তবেই রথ চলে, তেমনই স্বামী এবং স্ত্রী আলাদা আলাদা অধিকার থাকলে তবেই সংসার চলে । আর যদি সমান অধিকার দেওয়া হয় তবে নারীর মত পুরুষ গর্ভধারণ কি করে করবে ? অতএব যার যার নিজের অধিকারই সমান অধিকার । এতে দুজনেরই স্বাধীনতা থাকে ।

নিজের নিজের অধিকারই সর্বোত্তম । আমাকে অল্প অধিকার দিয়েছে আর পুরুষকে বেশী অধিকার দিয়েছে – এইরকম মানসিক ভাবনা থেকেই বাসনার উৎপত্তি হয় যে আমার সমান অধিকার চাই, পূর্ণ ক্ষমতা চাই । এই বাসনার কারণ – ভ্রান্তধারণা আর মূর্খতা । যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সামান্য অধিকারও যথেষ্ট । কর্ত্তব্য বেশী হওয়া উচিৎ । কর্ত্তব্যের ভৃত্য হচ্ছে অধিকার, কিন্তু অধিকারের দাস কর্ত্তব্য নয় । যদি নিজের কর্ত্তব্য উপযুক্তভাবে পালন করা যায় তবে সংসার, সন্ত-মহাত্মা, শাস্ত্র আর ভগবান – এরা সকলেই অধিকার দিয়ে দেন ।

ক্ষমতা পাওয়ার ইচ্ছা জন্ম মৃত্যুর কারণ হয় এবং নরকে নিয়ে যায় । আমি এরকম দেখেছি যে এক পাড়ার কুকুর অন্য পাড়ায় গেলে সেই পাড়ার কুকুর এই কুকুরকে কামড়াতে আসে । দুই কুকুর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে । আগন্তুক কুকুর যদি মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং পা ওপরে তুলে দেয়, নম্রতা স্বীকার করে তাহলে এই পাড়ার কুকুর ঐ কুকুরের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের আত্মতুষ্টিতে খুশী হয় । কারণ হচ্ছে যে এই কুকুর নিজের পাড়ার ওপর নিজের অধিকার মনে করে আর বেপাড়ার কুকুর যদি সেই পাড়ার ওপর নিজের অধিকার দাবী না করে নম্র হয়ে, সেটা স্বীকার করে তাহলে ঝগড়া মিটে গেল । এর থেকে এই বোঝা যায় যে বেশী অধিকার পাওয়ার আকাঙ্খা তো কুকুরের ভেতরেও আছে । এইরকম আকাঙ্খা যদি মানুষের মধ্যেও থাকে তবে সে কেমন মানুষ ? বেশী ক্ষমতা পাওয়ার লালসা নীচ মানুষের থাকে । যে মহৎ হয় সে তার নিজ কর্ত্তব্যকেই আগ্রহের সহিত উপযুক্তভাবে পালন

করে। কর্ত্তব্যের পালন করলে তার ক্ষমতা নিজের থেকেই বেশী হয়ে আসে।

বাস্তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে নারীর অধিকার কম নয়। তাকে সংসারের কর্ত্রী, গৃহলক্ষ্মী বলা হয়। সংসারের যে যে লোক বাইরের কাজকর্ম করে তারা ঘরে এসে গৃহিণীরই আশ্রয় নেয়। গৃহিণী গৃহের সকলের আশ্রয় দাত্রী। সে সকলকে সেবা করে, সকলকে পালন করে। সুতরাং তার অধিকার অনেক বেশী, সে সকলের জন্য করে। কিন্তু যখন সে নিজ কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়, তখনই তার মনে বেশী অধিকার পাওয়ার লালসার জন্ম নেয়।

প্রঃ— আজকাল নিদারুন মূল্যবৃদ্ধির দিনে স্ত্রীও যদি চাকরি করে তবে ক্ষতি কি ?

উঃ— নারীর হৃদয় কোমল তাই সে চাকরীর কষ্ট, তাড়না, তিরস্কার ইত্যাদি সহ্য করতে পারে না। সামান্য একটু অন্যরকম কথা শুনলেই এদের চোখে জল এসে যায়। চাকরীকে গোলামী, দাসত্ব, তুচ্ছতা যাই বলা যাক, সবই এক অর্থবাচক। পুরুষতো গোলামী সহ্য করতে পারে কিন্তু নারী তা পারে না। সেইজন্য চাকরী, খেতখামার, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ পুরুষের ওপর ন্যস্ত আর সংসারের ঘরের কাজ স্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। সুতরাং নারীর প্রতিষ্ঠা, আদর ঘরের কাজ করার মধ্যেই রয়েছে। বাইরের কাজ করলে নারীর অপবাদ হয়। যদি নারী সম্মানের সঙ্গে উপার্জন করতে পারে তাহলে কোনও ক্ষতি নেই অর্থাৎ সে নিজের ঘরে বসেও জীবিকা উপার্জন করতে পারে যেমন – সোয়েটার বোনা, পোষাক তৈরী করা, কারুকার্য্য সূচীকর্ম, ভগবানের চিত্রমূর্ত্তি সাজানো, এইসব কাজ করলে সে কারুর গোলাম হবে না, পরাধীন থাকবে না।

❈ ❈ ❈

(৫) ঝগড়া-বিবাদের সমাধান

প্রঃ– পরিবারের মধ্যে ঝগড়া, কলহ, অশান্তি ইত্যাদির কারণ কি ?

উঃ– প্রত্যেক প্রাণীই নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে চায়, নিজের অনুকূলতা চায়, নিজের সুখ সুবিধা চায়, নিজের মহিমা চায়, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় – এইসব ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেই সংসারে ঝগড়া, কলহ, অশান্তি ইত্যাদি হয় । যেমন কুকুর নিজেদের মধ্যে বেশ সুন্দর খেলা করে, কিন্তু যেইমাত্র রুটীর টুকরো সামনে আসে সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় । অতএব ঝগড়ার কারণ রুটির টুকরো নয়, ঝগড়ার কারণ হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ ।

পরিজন (কুটুম্ব) দের মধ্যে যে কেবল নিজের সুখ সুবিধাই চায় সে পরিজন নয়, সে আসলে একজন ব্যক্তি মাত্র । পরিজন তাকেই বলে যে আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বড়, ছোট আর সমান অবস্থা সকলেরই মঙ্গল কামনা করে এবং ভাল করে* । অতএব যে পরিজন শান্তি চায় কলহ চায় না, তার নিজের কর্ত্তব্য এবং অপরের অধিকারের দিকে নজর রাখা দরকার অর্থাৎ নিজের কর্ত্তব্য পালন করা উচিৎ আর অপরের ভাল করা উচিৎ, আদর-আপ্যায়ন, সুখ সুবিধা দেখা উচিৎ ।

প্রঃ– ভাই ভাই যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে তবে মাতাপিতার কি কর্ত্তব্য ?

উঃ– মাতাপিতার ন্যায়কথা বলা উচিৎ । তারা ছোট ছেলেকে বলবে যে তুমি ভরত, লক্ষ্মন আর শত্রুঘ্নকে দেখ যে তারা রামচন্দ্রের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে ; ভীম, অর্জুন এরা নিজেদের বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে। বড় ছেলেক বলবে যে তুমি

---

*অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গননা লঘুচেতসাম্ ।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

"এটা আমার এটা পরের – এইপ্রকার বিচার সঙ্কুচিত মনের ব্যক্তিই করে । উদার ব্যক্তির জন্য তো সম্পূর্ণ বিশ্বই নিজের পরিজনের সমান ।"

রামচন্দ্রকে দেখো যে সে নিজের ছোটভাইদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে* ; আর যুধিষ্ঠির নিজের ছোটভাইদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতেন । অতএব তোমরা সকলে ওঁদের চরিত্রকে আদর্শ মনে করে নিজেরা তদনুরূপ আচরণ করো ।

প্রঃ– ভাই-বোন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে পিতামাতার কি করণীয় ?

উঃ– মাতাপিতার মেয়ের পক্ষ নেওয়া উচিৎ ; কারণ সে মাতৃমূর্ত্তি, দানের পাত্র ।* সে ত ক'দিন পরেই পরের ঘরে চলে যাবে ; সুতরাং সে বড়ই আদরণীয়া । ছেলে ত ঘরের মালিক, ঘরেই সে থাকবে । ছেলেকে একলা ডেকে বলা দরকার যে, "বাবা ! বোনের অনাদর করো না, ও এ বাড়ীতে থাকবে না । ও তো নিজের বাড়ীতে চলে যাবে । তুমি ত এ বাড়ীর কর্ত্তা ।"

বোনের উচিৎ যে সে ভাইয়ের কাছে কোনও প্রত্যাশা না রাখে । ভাই যা দেয় তার থেকেও সামান্যই নেওয়া । তার এই চিন্তা করা উচিৎ যে ভাইয়ের সংসার থেকে নিলে আমার ত সব প্রয়োজন মিটবে না ! আমার প্রয়োজন ত আমার নিজের বাড়ীর থেকেই মেটাতে হবে ।

প্রঃ– ছেলে আর ছেলের বৌ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে পিতামাতার কর্ত্তব্য কি ?

উঃ– মাতাপিতা ওদের দু'জনকে বোঝাবে যে আমরা কতদিন আর থাকব ? এই সংসারের মালিক তো তোমরাই । যদি তোমরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো তবে এই পরিজনদের কে দেখাশুনা করবে ? কারণ এদের দায়িত্ব ত সব তোমাদেরই ওপর । ছেলেকে আলাদা করে বোঝাবে যে "বাপ্ তোমার জন্যই তোমার স্ত্রী তার মাতা পিতা সকলকে ত্যাগ করেছে । তুমি ত তোমার নিজের বাবার বাড়ীতে

---

*(এর জন্য গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত "তত্ত্বচিন্তামণি" পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে "রামায়নে আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম" নামক লেখা মনযোগ দিয়ে পড়া উচিৎ ।)

*বোন, মেয়ে আর ভাগ্নীকে ভোজন করান ব্রাহ্মণকে ভোজন করান সমান পুণ্য মনে করা হয় ।

বাস করছ, তুমি কি ত্যাগ করেছ ? সুতরাং এইরকম ত্যাগী স্ত্রীকে তোমার নিজের শরীর, মন, ধন ইত্যাদি দিয়ে সুখে রাখা, তার ভরণ পোষণ করা তোমার একান্ত কর্তব্য । তবে হ্যাঁ, একথা মনে রেখো যে তুমি স্বামী, সুতরাং স্ত্রীর দাস্যতায় বদ্ধ হয়ে যেও না, তার গোলাম হয়ো না । যাতে তার মঙ্গল হয়, আসক্তিবিহীন হয়ে সেই কাজ করো । মনুষ্যমাত্রেরই এটা কর্তব্য যে জীবমাত্রেরই মঙ্গল সাধন করে । তুমি তোমার একমাত্র স্ত্রীর মঙ্গল যদি না করো তবে আর কি করলে ?

পুত্রবধুকে বোঝান উচিৎ যে "বৌমা তুমি কেবলমাত্র তোমার স্বামীর জন্যই নিজের পিতামাতা, ভাইবোন, ভাইয়ের সন্তান সব ছেড়ে এসেছ, যদি ওকে খুসী না রাখতে পার, ওর সেবা করতে না পার তাহলে আর কি করতে পারবে ? কেউ যদি সমুদ্র পার হয় এসে তীরে এসে ডুবে যায় তবে তা কতবড় লজ্জার কথা ! তোমার ত একই ব্রত পালন করা প্রয়োজন –

"একই ধর্ম এক ব্রত নেমা । কাঁয় বচন মন পতি পদ প্রেমা ।"

(রামচরিত মানস, অরণ্য - ৫/৪)

প্রঃ– ননদ (মেয়ে) আর বৌদি নিজেদের মধ্যে যদি ঝগড়া বিবাদ করে তবে মাতা পিতার কি করা উচিৎ ?

উঃ– মায়ের উচিৎ মেয়েকে বোঝান যে, "দেখ্ মা, তোর বৌদি ত আজকালকার মেয়ে । ও যদি কোনও কিছু বলে তুমি বৌদিকে জ্যেষ্ঠ মনে করে তাকে সম্মান করো । ও-ই এই বাড়ীর মালিক, সুতরাং তুমি আমার চেয়েও বেশী করে বিশেষভাবে তাকে আদরযত্ন করো । আমাকে কখনও কম আদর করলেও আমি সহজে অসন্তুষ্ট হব না ; কারণ কি আমার কন্যা হওয়ার দরুন তোমার প্রতি আমার স্নেহ রয়েছে ।

বৌদির উচিৎ যে সে ননদকে বেশী আদর করে, কারণ ননদ ত বাড়ীতে অতিথির মত । সেই ননদের সন্তানদের নিজের সন্তানের

চেয়েও বেশী আদর করে।* সন্তান খুশী হলে তাদের মাও খুশী হয় – এইভাবে ননদকে খুশী রাখা উচিৎ। অপরেক খুশী রাখলে নিজের কল্যাণ,হয়।

মেয়ের ওপর স্নেহ থাকার জন্য মা যদি মেয়েকে কিছু দিতে চায় তাহলে মেয়ের তা নেওয়া উচিৎ নয়। মাকে বলা উচিৎ যে "আমাকে বৌদি যদি দেয় তবেই নেব। যদি তুমি দাও তবে বৌদির খারাপ লাগবে, আর সে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে। কাজেই আমি এখানে তো ঝগড়া করবার জন্য আসিনি। মা, তোমার কাছ থেকে যদি নেব তাহলে কতদিন আর নেব কিন্তু বৌদির কাছ থেকে নিলে অনেকদিন পর্য্যন্ত পেতে থাকব। অতএব ত্যাগের দৃষ্টিতে, ব্যবহার দৃষ্টিতে এবং স্বার্থদৃষ্টিতে বৌদির হাত থেকে নেওয়াই ভাল।"

প্রঃ– বড় ভাই যদি বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তবে ছোট ভাইয়ের কি কর্ত্তব্য ?

উঃ– ছোটভাই বড় ভাইয়ের পায়ে ধরে প্রণাম করে প্রার্থনা করবে যে "দাদা, তুমি যদি এইরকম ব্যবহার কর তবে কাকে আদর্শ মানব ? অতএব তুমি আমাদের ওপর দয়া করে মা বাবার সঙ্গে ভালরকম ব্যবহার করো। এইরকম করলে তোমার দুরকম লাভ হবে, এক তো তোমার ভাল ব্যবহারের প্রভাব পরিজনদের ওপর, পাড়া প্রতিবেশীদের ওপর পড়বে এবং সুনাম হবে, আর দ্বিতীয়তঃ তোমার ব্যবহার অনুসরণ করে আমরাও ওইরকম ব্যবহার করব, যাতে তোমার পুণ্য হবে। সুতরাং তোমার ব্যবহার আদর্শ হওয়া দরকার। আমি তো তোমার কাছে কেবল প্রার্থনাই করতে পারি কারণ তুমি আমার কাছে আমার পিতার সমান।"

প্রঃ– ছোট ভাই যদি মাতা পিতার সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তবে বড় ভাই এর কি কর্ত্তব্য ?

---

*বাড়ীর বৌয়ের সর্বপ্রথম (সবচেয়ে বেশী) ননদদের সন্তানদের আদর ভালবাসা দেখানো দরকার। এইরকম ভাবেই দ্বিতীয়তঃ দেওরের সন্তানদের, তৃতীয়তঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তানদের, চার নম্বরে শাশুড়ীর সন্তানদের এবং পঞ্চমতঃ নিজের সন্তানদের আদর-যত্ন করা দরকার।

উঃ– বড় ভাই ছোট ভাইকে উপদেশ দেবে যে, "দেখো ভাই, আমি এবং তুমি আমরা সবাই ছোট। মাতাপিতা আমাদের কাছে সর্বদা সম্মানীয় এবং পূজ্য। যেই শরীরের দ্বারা আমরা ভগবানকে পেতে পারি, সেই শরীর আমরা মাতাপিতার কৃপায়ই পেয়েছি। আমরা ওঁদের ঋণ থেকে কখনই মুক্ত হতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আমরা যদি ওঁদের মনমত ব্যবহার করি তাহলে ওঁরা খুশী হবেন, এবং ওঁরা খুশী হলে সেই ঋণ শোধ হতে পারে। আমরা যদি নিজেদের চামড়া দিয়ে ওঁদের পায়ে জুতো পরিয়ে দিই তাহলেও ওঁদের ঋণ শোধ করা যায় না, কারণ ওই চামড়া এসেছে কোথা থেকে ? ওঁদের জিনিসই যদি ওঁদের দিই তাহলে আমাদের নিজেদের কি দিলাম ? ওঁদের জিনিস আমরা নিজেদের মনে করি এটাই ভুল। ওঁদের যেমন ইচ্ছা আমাদের রাখতে পারেন, আমাদের ওপর সেই অধিকার ওঁদের পূর্ণমাত্রায় আছে।"

প্রঃ– বোন যদি বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তবে ভাইদের কি কর্তব্য ?

উঃ– ভাই ন্যায় অন্যায় বিচার করে এবং ন্যায় মত বোনের পক্ষ সমর্থন করে মাতা পিতাকে বলবে যে বোন অতিথির মত এসেছে। একে আদর সোহাগ করা দরকার। আর যদি বোনের অন্যায় দেখে তবে বোনকে একলা ডেকে বোঝান উচিৎ যে, "বোন, নিজেদের মধ্যে প্রেম ভালবাসার মহিমা অতি মহান, ঝগড়ার কোনও মহিমা নেই। মা বাবা সম্মানীয়। অতএব তোমার এবং আমার মা বাবাকে সম্মান করা উচিৎ। সামান্য ব্যাপারে ওদের অসম্মান করা ভাল নয়।

প্রঃ– ছোট ভাই যদি বৌদির সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তবে বড় ভাইএর কি কর্তব্য ?

উঃ– বড় ভাই ছোট ভাইকে শাসন করে বলবে যে, "তুমি কি করছো ? শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বড় ভাইএর স্ত্রী মায়ের সমান। লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন সীতার সাথে কি রকম ব্যবহার করতেন, তাদের চরিত্র বার বার পড়ো আর চিন্তা করো, এতে তোমার ভেতরে নির্মল ভাবের উদয় হবে, তোমার বুদ্ধি আপনি আপনি শুদ্ধ হয়ে যাবে।"

প্রঃ— বড় বউ এবং ছোট বউ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে ভাইদের কি করা উচিৎ ?

উঃ— ভাইয়েদের উচিৎ নিজের নিজের স্ত্রীদের বোঝান । ছোট ভাই তার স্ত্রীকে বলবে কি "দ্যাখো বড় ভাইকে পিতার সমান এবং তার স্ত্রীকে মায়ের সমান জ্ঞান করে তোমার ওদের সম্মান করা উচিৎ ।" বড় ভাই তার স্ত্রীকে বলবে, "তোমার ওদের স্নেহ করা দরকার । ওর স্ত্রী যদি কিছু বলেও তোমার সেটা ক্ষমা করে দেওয়া উচিৎ কারণ তুমি বড় । যদি তুমি ওর কথা সহ্য করতে না পার তবে তোমার স্থান উঁচু কি করে হল ? ওর কথা সহ্য করলে, ওকে স্নেহ ভালবাসা দিলেই ত তোমার স্থান উঁচু হবে । ক্রোধ যে করে সে পরিণামে হেরেই যায় আর অন্যের ক্রোধ যে ধৈর্য্য ধরে সহ্য করে সে পরিণামে জিতেই থাকে" ।

দুই ভাইয়েরই এই ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার যে বৌদের ঝগড়া কখনও তারা নিজেদের মধ্যে আনবে না । নারী জাতির সহ্যশক্তি (স্বভাব) কম হয়, সুতরাং ভাইদের খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার যাতে নিজেদের মধ্যে খটামটি না লাগে । যদি বৌদের নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হয় তবে আলাদা আলাদা থাকা দরকার* এবং আলাদা হওয়া প্রেম ভালবাসা বজায় রাখবার জন্যই হওয়া উচিৎ । যদি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে খটামটি থেকে যায় তবে আলাদা হওয়া কিসের জন্য ? সুতরাং ভালবাসার জন্যই একত্র থাকা আর ভালবাসার জন্যই আলাদা হওয়া । আলাদা হলেও নিজেদের ভাগ নিয়ে কলহ হওয়া উচিৎ নয় । ছোট ভাইএর উচিৎ যে বড়ভাই যা দেয় তাই নেওয়া আর বড় ভাইএর উচিৎ যে তার হিসাব মত সে ছোট ভাইকে বেশী দেয়, কারণ ও ছোট এবং স্নেহের পাত্র । নিজের হিসাব মত বেশী দেওয়া সত্ত্বেও যদি ছোট ভাই

---

*রোজা নারী রাড়, আপসকী আছী নহী,
বনে জহাঁতক বাড় চটপট কীজে চাকরিয়া ।

অর্থাৎ, রোজ রোজ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা ঠিক নয়, যতদিন সম্ভব একসাথে থাকা নয়ত আলাদা হয়ে যাওয়া ।

তার হিসাব মত উচিৎ না মনে করে তাহলে বড় ভাইএর উচিৎ ছোটভাইএর হিসাবই মেনে নেওয়া নিজের হিসাব নয়।

ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার। সামান্য সামান্য জিনিষের জন্য রাগ দ্বেষের বশীভূত দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর ভুল, কারণ পার্থিব জিনিষ ত পৃথিবীতে থেকে যাবে কিন্তু রাগ দ্বেষ সাথে যাবে। এইজন্য মানুষের সাবধান থাকা দরকার আর নিজের অন্তঃকরণকে কখনও ময়লা করা উচিৎ নয়।

প্রঃ— দুই ভাইয়ের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ করলে ভাইয়েদের কি কর্ত্তব্য ?

উঃ— যতটা পারা যায় নিজের ছেলের পক্ষ না নেওয়া, ভাইয়ের ছেলের পক্ষ নেওয়া। যদি ভাইয়ের ছেলে অন্যায় করে তবে তাকে শান্তভাবে বোঝান দরকার। এর তাৎপর্য্য হল যে নিজের স্বার্থ আর অভিমান ত্যাগ করতে পারলে সকলের সাথেই ব্যবহার মধুর হবে।

প্রঃ— মা আর পত্নী (শাশুড়ী এবং বৌ) যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে তবে ছেলের কি কর্ত্তব্য ?

উঃ— এই রকম অবস্থায় পুত্রের বড় সঙ্কটময় পরিস্থিতি। সে যদি মায়ের পক্ষ নেয় তবে স্ত্রী কাঁদতে আরম্ভ করে, আর স্ত্রীর পক্ষ নিলে মা কষ্ট পায় যে ছেলে ত বৌয়ের হয়ে গেছে, আমার আর নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে ছেলে বিশেষভাবে মায়েরই সম্মান রাখবে মায়েরই কথা রাখবে আর স্ত্রীকে আলাদাভাবে বোঝাবে যে, "তোমার এবং আমার কাছে আমার মায়ের সমান পূজনীয় এবং সম্মানীয় আর কেউ নেই। তোমার এবং আমার দুজনেরই হিতাকাঙ্খী এবং মঙ্গলকর্ত্রী আমার মায়ের মত আর কেউ নেই। মা যদি তোমাকে কখনও দু চারটে অপ্রিয় কথাও বলে তবুও অন্তর থেকে সে কখনও তোমার অমঙ্গল চাইবে না বরং সর্বদা মঙ্গলই চায়। আর তুমি যদি আমাকে সুখী রাখতে চাও তবে মাকে সুখী করো।" ছেলের সর্বদা উচিৎ যাতে সে স্ত্রীর বশবর্ত্তী হয়ে স্ত্রীর কথায় পড়ে কারুর সাথে কলহ, বিবাদ দ্বেষ

না করে। স্ত্রীর কথা শুনে মা, বোন এদের কটু কথা বলা, অপমান করা বড় ভয়ংকর অপরাধ।

মাকেও আলাদাভাবে বোঝান যে "মা, ওই মেয়েটা নিজের মা বাপ, ভাই বোন ইত্যাদি সকলকে ছেড়ে এসেছে, সুতরাং এখন তুমিই ওকে স্নেহ ভালবাসা দিতে পার। ওর কষ্ট বোঝবার এখন আর দ্বিতীয় কে আছে ? ও নিজের সুখ দুঃখের কথা কাকে বলবে ? তুমিই ত এখন ওর মা। ওর ব্যবহারে তোমার মনে যদি কখনও আঘাত লাগে তাহলেও সেটা সহ্য করে মানিয়ে নেওয়া উচিৎ। তুমি এবং আমি দুজনেই যদি ওর সুখ সুবিধার দিকে নজর না রাখি তবে ও যাবে কোথায় ? তাই, মা ওকে ক্ষমা করো। আমি ছোটবেলা কতবার তোমার কোলে পেচ্ছাব-পাইখানা করে দিয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে নিজেরই শরীর মনে করে আমার ওপরে কখনও রাগ করো নি বরং ক্ষমা করেছ এবং আমার ওই কাজগুলিকে কখনই আমার অপরাধ মনে করো নি। তেমনই একেও নিজের শরীর মনে করে ক্ষমা করে দিও। যেমন কখনও কখনও দাঁত দিয়ে জিহবা কেটে গেলে দাঁতের সাথে শত্রুতা মনে হয় না, দাঁতের উপর রাগ হয়না তেমনই ওর দ্বারা কোনও আঘাত পেলেও তোমার রাগ করা উচিৎ নয়, কারণ ওতো তোমার নিজেরই শরীর। যেমন আমি তোমার অঙ্গ তেমনই আমার স্ত্রী আমার অঙ্গ হওয়াতে সে তোমারও শরীর।

প্রঃ– পত্নী আর পুত্রবধূ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে স্বামীর অর্থাৎ পুত্রবধূর শ্বশুরের কি করা উচিৎ ?

উঃ– স্বামীর উচিৎ যে সে তার নিজের স্ত্রীকে শাসন করে আর পুত্রবধুকে সান্ত্বনা দেয় যে আমি তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলব। নিজের স্ত্রীকে আলাদাভাবে বোঝাও যে, "দেখো, তুমিই এর মা, এ মাতাপিতা, ভাইবোন সকলকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসেছে। সুতরাং তোমার কর্তব্য হল যে তুমি একে নিজের মেয়ের মত যত্ন করো, আদর করো। এ তার নিজের দুঃখের কথা তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে বলবে ? নিজের ভরসা, আশ্রয় এর জন্য ও কার কাছে যাবে ?

না করে। স্ত্রীর কথা শুনে মা, বোন এদের কটু কথা বলা, অপমান করা বড় ভয়ংকর অপরাধ।

মাকেও আলাদাভাবে বোঝান যে "মা, ওই মেয়েটা নিজের মা বাপ, ভাই বোন ইত্যাদি সকলকে ছেড়ে এসেছে, সুতরাং এখন তুমিই ওকে স্নেহ ভালবাসা দিতে পার। ওর কষ্ট বোঝবার এখন আর দ্বিতীয় কে আছে ? ও নিজের সুখ দুঃখের কথা কাকে বলবে ? তুমিই ত এখন ওর মা। ওর ব্যবহারে তোমার মনে যদি কখনও আঘাত লাগে তাহলেও সেটা সহ্য করে মানিয়ে নেওয়া উচিৎ। তুমি এবং আমি দুজনেই যদি ওর সুখ সুবিধার দিকে নজর না রাখি তবে ও যাবে কোথায় ? তাই, মা ওকে ক্ষমা করো। আমি ছোটবেলা কতবার তোমার কোলে পেচ্ছাব-পাইখানা করে দিয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে নিজেরই শরীর মনে করে আমার ওপরে কখনও রাগ করো নি বরং ক্ষমা করেছ এবং আমার ওই কাজগুলিকে কখনই আমার অপরাধ মনে করো নি। তেমনই একেও নিজের শরীর মনে করে ক্ষমা করে দিও। যেমন কখনও কখনও দাঁত দিয়ে জিহবা কেটে গেলে দাঁতের সাথে শত্রুতা মনে হয় না, দাঁতের উপর রাগ হয়না তেমনই ওর দ্বারা কোনও আঘাত পেলেও তোমার রাগ করা উচিৎ নয়, কারণ ওতো তোমার নিজেরই শরীর। যেমন আমি তোমার অঙ্গ তেমনই আমার স্ত্রী আমার অঙ্গ হওয়াতে সে তোমারও শরীর।

প্রঃ– পত্নী আর পুত্রবধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে স্বামীর অর্থাৎ পুত্রবধুর শ্বশুরের কি করা উচিৎ ?

উঃ– স্বামীর উচিৎ যে সে তার নিজের স্ত্রীকে শাসন করে আর পুত্রবধুকে সান্ত্বনা দেয় যে আমি তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলব। নিজের স্ত্রীকে আলাদাভাবে বোঝাও যে, "দেখো, তুমিই এর মা, এ মাতাপিতা, ভাইবোন সকলকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসেছে। সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য হল যে তুমি একে নিজের মেয়ের মত যত্ন করো, আদর করো। এ তার নিজের দুঃখের কথা তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে বলবে ? নিজের ভরসা, আশ্রয় এর জন্য ও কার কাছে যাবে ?

মালিক আমার মার যদি কিছু বলার থাকে তো আপনাকেই বলবে। আপনি ছাড়া ওঁর কথা শোনবার দ্বিতীয় কে আছে ? বিবাহের সময় আপনি অগ্নি এবং ব্রাহ্মণের সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পালন করা উচিৎ। মা তার নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করে কিনা, সেদিকে নজর না দিয়ে আপনার নিজের কর্ত্তব্য পালন করা উচিৎ। আপনি যদি নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করে চলেন তাহলে আমার এবং আমার মায়ের ইহলোক পরলোক সুখের হবে, না হলে আমরা দুজন কোথায় যাব ? আপনি না থাকলে আমাদের দুজনের কি দশা হবে ? আমি আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছিনা, কেবল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি কিছু অন্যায়ও বলে থাকি তবে আপনি ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি বড় – **"ক্ষমা বড়নকো চাহিয়ে, ছোটনকো উৎপাত, কহা বিষ্ণুকো ঘট গয়ো, যো ভৃগু মারী লাথ।"** ভৃগুমুনি লাথি মেরেছিলেন তাতে বিষ্ণু ভগবানের কোনও ক্ষতি হয়নি বরং তার মাহাত্ম্য বেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং আপনি নিজেই ভাবুন। আমি আপনাকে কি বোঝাব, আপনি নিজেই ত সব জানেন।"

সংসারে ঝগড়াঝাঁটি না হয় – এর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য হচ্ছে সে নিজের স্বার্থত্যাগ করে অপরের স্বার্থ রক্ষা করে। প্রত্যেক মানুষ নিজের গুরুত্ব এবং সম্মান চায়, সুতরাং অপরকে গুরুত্ব এবং সম্মান দেওয়া উচিৎ।

প্রঃ– শাশুড়ী যদি ছেলের পক্ষ নিয়ে বৌকে নাকাল করে তবে বৌয়ের কি করা উচিৎ ?

উঃ– বৌয়ের বোঝা উচিৎ যে শাশুড়ী তো সংসারের কর্ত্তা। আমি ত অন্য বাড়ী থেকে এসেছি। সুতরাং ইনি যদি কিছু বলেনও, বা কিছু করেন, আমার ত তাই করা উচিৎ যাতে ইনি সুখী হন। শাশুড়ীর সাথে বৌয়ের ভাল ব্যবহার করা দরকার, তার সঙ্গে হিংসা করা উচিৎ নয়। বৌয়ের নিজের মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষা করা উচিৎ, নিজের স্থিতি অশুদ্ধ হতে দেওয়া উচিৎ নয়। তার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ যে "হে নাথ। এঁকে সদ্‌বুদ্ধি দাও আর আমাকে সহিষ্ণুতা দাও।"

প্রঃ— স্বামী এবং শ্বশুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে তো বৌয়ের কি করা উচিৎ ?

উঃ— বৌয়ের উচিৎ যে সে তার স্বামীকে বুঝাবে যে – "এ বাড়ীতে যা কিছু আছে সব শ্বশুর মশাইরই জিনিস । তোমার মাকেও শ্বশুর মশাইই এনেছেন । ধন, সম্পত্তি, জমি, জায়গা, বাড়ী ঘর ঐশ্বর্য্য সবই শ্বশুর মশাই বানিয়েছেন । সুতরাং তাঁকে সব রকম মানমর্য্যাদা দেওয়া উচিৎ । তাঁর কথা শোনা উচিৎ, এটাই ধর্ম এবং তোমার কর্ত্তব্য । কোনও লেখাপড়ার মধ্যে না গিয়েও তুমি ওঁর সম্পত্তির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী । সুতরাং তিনি যাই কিছু বলুন না কেন সেই সবই তোমার মেনে নেওয়া উচিৎ । তোমার শরীর, মন বাণী ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিৎ । তিনি যদি কখনও রাগের বশে কিছু বলেও ফেলেন, তোমার তখন এই মনে করা উচিৎ যে আমার মঙ্গল করবার জন্য ওঁর থেকে অন্য আর কেউ নেই । সুতরাং ওঁর মনে কখনও দুঃখ দেওয়া উচিৎ নয় । এমন কি আমিও যদি কখনও কিছু অনুচিত বলে ফেলি সেক্ষেত্রে আমার কথা গ্রাহ্য না করে শ্বশুর মশাইয়ের কথাকেই মানা উচিৎ ।

প্রঃ— স্বামী এবং ছেলে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করলে স্ত্রীর কি করা উচিৎ ?

উঃ— স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর পক্ষ সমর্থন করা আর পুত্রকে বোঝান যে, "বাবা, তোমার বাবা যা কিছু বলে, যা কিছু করে তার পেছনে সর্বদাই তোমার প্রতি তার মঙ্গল চিন্তা কাজ করে । সে কখনও তোমার অমঙ্গলজনক কিছু করতেই পারে না এমন কি অন্য কেউ যদি তোমার অমঙ্গলজনক কিছু করে সেটা পর্য্যন্ত সে সইতে পারে না । কাজেই এই সব মনে রেখে তোমার উচিৎ তোমার বাবার সেবাকার্য্যে তৎপর থাকা । তুমি আমার প্রতি ভালবাসা কম দেখাও তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু বাবাকে সর্বদা বেশী সম্মান করবে । আসলে আমার মালিকও ত তিনিই । আমাকে যদি তুমি কম সম্মান দেখাও তবে আমি অখুশী হব না কিন্তু তোমার বাবা যেন অখুশী না হন । আমিও সর্ব্বদা ওঁকে খুশী

রাখবার চেষ্টা করি আর তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে সর্ব্বদা ওঁকে খুশী রাখা।"

প্রঃ– পত্নী আর পুত্র নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করলে পুরুষের কি কর্ত্তব্য ?

উঃ– সেই ছেলেকে বোঝান দরকার যে, "বাবা, মাকে খুশী রাখা তোমার বিশেষ কর্ত্তব্য। সংসারে যত রকম সম্বন্ধ আছে সকলের চেয়ে মায়ের সম্বন্ধ উঁচু। কাজেই তোমার স্ত্রীর বশীভূত হয়ে তোমার মায়ের মনে ব্যাথা দেওয়া উচিৎ নয়।" "নিজের স্ত্রীকে বলা যে, "তুমি একে পেটে ধরেছ, জন্ম দিয়েছ, নিজের স্তনদুগ্ধ পান করিয়েছ। তোমার কোলে বাহ্যে প্রস্রাব করা সত্ত্বেও তুমি কোনদিনও রাগ করোনি বরং আনন্দের সঙ্গে সেই কাপড় ধুয়ে দিয়েছ। এখন যদি সে তোমাকে কিছু কড়া কথা বলে তবুও নিজের আদরের ছেলে মনে করে একে ক্ষমা করে দিও, কারণ তুমি হচ্ছ মা। পুত্র কুপুত্র হতে পারে, কিন্তু মাতা কুমাতা হতে পারে না – **"কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি।"**

প্রঃ– সংসারে প্রেম আর সুখ শান্তি কি ভাবে থাকে ?

উঃ– যখন মানুষ নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, তখনই সব বাধা বিপত্তি আসে। আর সে যদি নিজের উদ্দেশ্যকে সব সময় মনে রাখে যে যাই হয়ে যাক, আমাকে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি করতেই হবে, তাহলে সে এই সব সুখ দুঃখকে গণনার মধ্যেই আনে না – **"মনস্বী কার্য্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখং।"** আর নিজের স্বার্থ এবং অভিমানকে ত্যাগ করলে তার আর কোনও কষ্ট হয় না। স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ হলে ব্যবহারের মধ্যে বাধা বা বিঘ্ন আসে না। ব্যবহারের মধ্যে, পরস্পরের ভালবাসার মধ্যে বাধা তখনই আসে যখন মানুষ নিজের বক্তব্য বজায় রাখতে চায়, নিজের জিদ বজায় রাখতে চায়, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়।

অপরের কি করে ভাল হবে, তাদের কল্যাণ কিসে হবে, তাদের আদর আপ্যায়ন কি করে হবে, তাদের সুখ সুবিধা কি করে হবে – এই সব চিন্তা যখন নিজের আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তখন সব

পরিজন প্রসন্ন হয়ে যায় । কখনও কোনও পরিজন অপ্রসন্নও যদি হয় তাহলেও তার অপ্রসন্নতা থাকবে না, স্থায়ী হবে না, কারণ কখনও যখন সে নিজের মধ্যে ঠিক বিচার করবে তখন সে বুঝতে পারবে যে আমার মঙ্গল এই কথার মধ্যেই আছে । যেমন বালকদের যখন পড়ান হয় তখন খেলাধূলার মধ্যে মন মত্ত হয়ে থাকাতে পড়াশুনা ভাল লাগে না, তা সত্ত্বেও পরিণামে তার মঙ্গলই হয় । এই রকমই কোনও ব্যাপার ঠিক হওয়া সত্ত্বেও কারুর যদি সেটা ভাল না লাগে, তাহলে সেই সময়ে ব্যাপারটা সে বুঝতে না পারলেও, ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে । ক্বচিৎ কদাচিৎ সে যদি বুঝতে নাও পারে তবুও আমার উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারে সন্তুষ্টি হবে যে আমি তার ভালই চাই এবং আমার মধ্যে একটা শক্তি সৃষ্টি হবে যে আমার কথা সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত ।

নিজেদের মধ্যে প্রেম থাকলেই সংসারে সুখশান্তি থাকে । নিজের স্বার্থ আর অভিমানের ত্যাগ হলেই প্রেম হয় । যখন স্বার্থ আর অভিমান থাকবে না তখন প্রেম ছাড়া আর কি থাকবে ? অপর ব্যক্তি আপন স্বার্থের বশীভূত হয়ে কখনও যদি আমার সাথে তিক্ত ব্যবহার করে তবে কখনও কখনও মনে এরকম চিন্তার উদয় হতে পারে যে আমি তো এর সাথে ভাল ব্যবহার করে যাচ্ছি তবুও এ খুশী হচ্ছে না, এখন আমি কি করব ! এই রকম চিন্তা হওয়ার কারণ হচ্ছে আমার মনে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত এক সুখ-লোলুপতা ; কারণ অন্য কোনও ব্যক্তিকে সুখী এবং প্রসন্ন দেখার মধ্যে একে রকম আত্মসুখ আছে । সুতরাং মনের মধ্যে এই রকম সুখ-লোলুপতার চিন্তা হলেই একে ত্যাগ করা উচিৎ । কারণ আমার কাজ হচ্ছে কেবল নিজের কর্তব্য করে যাওয়া, অপরের প্রাপ্য দেওয়া, তাদের ভালবাসা । আমার চিন্তা এবং আচরণের প্রভাব তার উপর পড়বেই । তবে হ্যাঁ, অন্তঃকরণের কঠোরতার দরুণ ওর উপরে যদি প্রভাব নাও পড়ে, তবু নিজের দিক থেকে ভালই করেছি – এই মনে করে আমার সন্তুষ্টি হলে আমার ভালবাসা কমবে না আর সংসারেও সুখ শান্তি বজায় থাকবে ।

।। শ্রী হরিঃ ।।

কর্ত্তব্য এবং অধিকার।

কর্মযোগ তখনই হয়, মানুষ যখন নিজের কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা অপরের অধিকার কক্ষা করে তখনই একে কর্মযোগ বলা হয়। যেমন মাতা পিতাকে সেবা করা পুত্রের কর্ত্তব্য আবার মাতাপিতারও এতে অধিকার আছে। যা অন্যের অধিকার সেটাই আমার কর্ত্তব্য হয়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই নিজের কর্ত্তব্য পালন দ্বারা অপরের অধিকার রক্ষা করা এবং অপরের কি কর্ত্তব্য সেদিকে নজর না দেওয়া কর্ত্তব্য। অপরের কর্ত্তব্যের দিকে নজর দিলে মানুষ নিজের কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়, কারণ অপরের কি কর্ত্তব্য সেটা দেখা আমার কর্ত্তব্য নয়। এর অর্থ হচ্ছে যে - অপরের মঙ্গল করা আমার কর্ত্তব্য আবার সেটাই অপরেরও অধিকার। যদিও অধিকার কর্ত্তব্যেরই অধীন, তবুও মানুষের নিজের অধিকারের দিকে নজর না দেওয়াই উচিৎ, বরং নিজের অধিকার ত্যাগ করা উচিৎ। কেবল-মাত্র অপরের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য নিজের কর্ত্তব্য পালন করা। অপরের কর্ত্তব্যের উপর লক্ষ্য রাখা আর নিজের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখা ইহলোকে ও পরলোকে ভয়ানক পতনের কারণ। বর্ত্তমান যুগে বাড়ীতে, সমাজে যে অশান্তি, কলহ, সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে, তার মূল কারণ হচ্ছে ওই যে মানুষ নিজের অধিকার তো দাবী করছে কিন্তু নিজের কর্ত্তব্যের পালন করছে না। - গীতার টীকা **'সাধক-সঞ্জীবণী'** গ্রন্থ থেকে।

।। শ্রীহরি।।

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 556 **গীতা-দর্পণ**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৪) 13 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।

(৫) 496 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(৬) 1393 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(৭) 395 **গীতা-মাধুর্য**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(৮) 957 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(৯) 954 **শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)**

তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১০) 275 **কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়**

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১১) 1456 **ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১২) 1119 **ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(১৩) 1305 **প্রশ্নোত্তর মণিমালা**

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(১৪) 1102 **অমৃত-বিন্দু**

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(১৫) 1115 **তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?**

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(১৬) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'** — সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(১৭) 1368 **সাধনা**

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সাধন-পথের জিজ্ঞাসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা।

(১৮) 1122 **মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?**

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

কোড নং

(১৯) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২০) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(২১) 1460 **বিবেক চূড়ামণি (মূল সহ সরল টীকা)**

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২২) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলি**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(২৩) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধনার সহজ দিগ্‌-দর্শন।

(২৪) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(২৫) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(২৬) 955 **তাত্ত্বিক-প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(২৭) 428 **আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(২৮) 296 **সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা**

(২৯) 1359 **পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি**

(৩০) 1140 **ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব**

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

	কোড নং	
(৩১)	1303	সাধকদের প্রতি
(৩২)	1452	আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৩)	1453	শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৪)	625	দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৩৫)	956	সাধন এবং সাধ্য
(৩৬)	1293	আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থেকয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৩৭)		সর্বসাধনার সারকথা
(৩৮)	450	ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৩৯)	449	দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪০)	451	মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪১)	443	সন্তানের কর্তব্য
(৪২)	469	মূর্তিপূজা
(৪৩)	849	মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৪৪)	1319	কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
		অন্যান্য
(৪৫)	762	গর্ভপাত করানো কি উচিত —আপনিই ভেবেদেখুন
(৪৬)	1075	ওঁ নমঃ শিবায়
(৪৭)	1043	নবদুর্গা
(৪৮)	1096	কানাই
(৪৯)	1097	গোপাল
(৫০)	1098	মোহন
(৫১)	1123	শ্রীকৃষ্ণ
(৫২)	1292	দশাবতার
(৫৩)	1439	দশমহাবিদ্যা
(৫৪)	1103	মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৫৫)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৬)	626	হনুমানচালীসা
(৫৭)	848	আনন্দের তরঙ্গ
(৫৮)	1356	সুন্দরকাণ্ড
(৫৯)	1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী